শান্তি-পাগল

বা

(গদ্য-পদ্যময়-ভগবদ্বিষয়ক স্তোত্রমালা ।)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক
প্রণীত ।
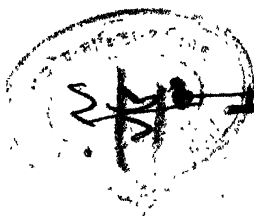
মৃজাপুর ২৩ নং কালীসিংহের লেন,
শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত ।

কলিকাতা

৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট আর্য্য-যন্ত্রে,
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ।

শকাব্দঃ ১৮১১ । জ্যৈষ্ঠ ।

উৎসর্গ।

ভগবন্ !

এই সাধন-ভজন-হীন অজ্ঞান ভক্তের হৃদয় হইতে ভক্তির উচ্ছ্বাসে সময়ে সময়ে যে সকল স্তোত্র নির্গত হইয়াছে, তাহাতে এমন কিছু নাই যে সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে। কিন্তু শুনিয়াছি তুমি নাথ! ভাবগ্রাহী। ভক্তের ভাষার আড়ম্বর অপেক্ষা ভাবের গভীরতায় তুমি অধিকতর পরিতুষ্ট হও। সেই আশায় এই স্তোত্রগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া আজ তোমার চরণে উৎসর্গ করিতেছি। আমার এই প্রাণোচ্ছ্বাসগুলি উপাদেয় না হইলেও ভক্তের প্রাণের উচ্ছ্বাস বলিয়া তোমার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইবে না বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই দেব! আমার 'এই শান্তি-পাগল' দিয়া আজ আমি তোমার পূজা করিলাম। দয়াময়! অকিঞ্চনের এই অকিঞ্চিৎকর উপহার চরণে ধারণ করিয়া আমার জীবনকে সার্থক কর। আমি দীন হীন কাঙ্গাল। আর কিছু দিয়া তোমার পূজা করি এমন সাধ্য আমার নাই!

পাবনা।
সন ১২৯৬। জ্যৈষ্ঠ।

ভক্তি-অবনত
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

শান্তি-পাগল।

আমি কে?

পাঠক! তোমার জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে আমি কে? আমি এক জন দীন হীন মুমুক্ষু। যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর সমস্ত বস্তুই অনিত্য ও অবিদ্যা-জনিত—আমি সেই আর্য্য মহর্ষিগণের চরণ-রেণু ধরিয়া আজ এই মুক্তি-মার্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস যে যতক্ষণ না আমি সেই অনন্ত ও অসীম চৈতন্য-সাগরে পড়িয়া বিলীন হইয়া যাইতেছি, ততক্ষণ আমার প্রকৃত শান্তি নাই। সাযুজ্য অবস্থাও আমার লক্ষ্য নহে। হর-পার্ব্বতী-মিলনই সাযুজ্য অবস্থার চূড়ান্ত আদর্শ। কিন্তু সে আদর্শও আমার মনে শান্তি প্রদান করে না। অন্যান্য ধর্ম্ম—সামীপ্য ও সালোক্য অবস্থাই মানবের চরম লক্ষ্য স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু আর্য্য-ধর্ম্ম ইহার দুই সিঁড়ি উপরে উঠিয়াছিল। সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ। সাযুজ্য ও নির্ব্বাণই হিন্দুধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এই দুই মহান্ ভাবে হিন্দুধর্ম্ম জগতে অতুলনীয়। সেই জন্যই আমি এক জন ভক্ত হিন্দু। আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাণ ব্যতীত মিটিবে না। অনন্ত-চৈতন্য-পিপাসা চৈতন্য-সাগরে বিলীন না হওয়া পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইবে না। আমি তাই আজ মুক্তিপথে দাঁড়াইয়াছি। আমি সেই নির্ব্বাণ বা পূর্ণ শান্তির জন্য পাগল হইয়াছি বলিয়াই আমার নাম "শান্তি-পাগল" রাখিয়াছি। সাযুজ্য, সালোক্য ও সামীপ্য—এ অবস্থাত্রিতয় হইতেও পতন আছে। কিন্তু নির্ব্বাণ-অবস্থা হইতে আর পতন নাই। যতক্ষণ কোন-প্রকার বিচ্ছিত্তি দ্বারা আমি জীব—পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিব, ততক্ষণ আমি তাঁহার যত নিকট-বর্ত্তী হই না কেন, তাঁহা হইতে পৃথক্ থাকিব। যে আকর্ষণে আমি

নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম, সেই আকর্ষণের বল কমিয়া গেলেই আমি তাঁহা হইতে আবার বিপ্রকৃষ্ট হইয়া পড়িব। যে পুণ্য-পুঞ্জের আকর্ষণে রাজা হরিশ্চন্দ্র জীববৃন্দ সহ স্বর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, আত্ম-কীর্ত্তি খ্যাপনে সেই পুণ্যক্ষয়িত হওয়ায় তাঁহাকে অমনি স্বর্গ হইতে অপসারিত হইতে হইয়াছিল। পুণ্যের আকর্ষণ একেবারে যায় নাই বলিয়া তাঁহার রথ শূন্যে বিলম্বিত হইয়াছিল। তিনি স্বর্গেও যাইতে পারিলেন না—মর্ত্তেও নামিতে পারিলেন না। এই জন্য আমি স্বর্গেরও প্রার্থী নহি, এবং এই জন্যই আমি মুমুক্ষু। কারণ মুক্তি ব্যতীত অনন্ত শান্তি লাভের আর আশা নাই। যদি একবার পরমে মিশিতে পারিলাম, তাহা হইলে আর আমার পতন নাই। তাই প্রেম ও ভক্তির রজ্জু দিয়া তাঁহাকে আমার সহিত সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছি। আশা—এই বন্ধনের গুণে কালে তিনি ও আমি এক হইয়া যাইব। তখন আমার ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া গিয়া "সোঽহং" এই জ্ঞান স্ফুরিত হইবে;

আত্মোৎসর্গ।

১১ই মার্চ্চ, ১৮৮৭।

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি চৈতন্যময় ব্রহ্ম! আজ প্রাণ ভরিয়া তোমার সেই অনন্ত সত্তায় আত্মাহুতি দিতেছি! ভক্তের এই অর্ঘ গ্রহণ কর। অকিঞ্চনের আর কি আছে যে তাহা দিয়া ভক্তি জানাইবে? যে পথে ব্রহ্মর্ষিগণ গমন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের বংশধর হইয়া আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় সেই পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সংসারের আবর্জ্জনারাশি ঠেলিয়া আজ আমি এই পবিত্র তীর্থ-স্থলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছি। তর্ক-শাস্ত্রের জটিল শৈবালদল ছেদন করিয়া আজ আমি চৈতন্য-সাগরের তীরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছি। কি মহান্ দৃশ্য! এই অনন্ত চৈতন্য-সাগরের কি অপূর্ব্ব শোভা! এ রাজ্যের সবই অপূর্ব্ব—সবই নূতন! এখানে নয়ন বুজিয়া দেখিতে হয়—ভোগ-স্পৃহা-শূন্য হইয়া অমৃত পান করিতে হয়! মুখ নড়ে না!—অথচ অবিরাম অমৃত পান করিতে

পাওয়া যায়। এ চৈতন্য সাগরে ডুবিতে পারিলে অনন্ত জীবন লাভ করা যায়। এ চৈতন্য-সাগরের জ্যোতিতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয়। এ আলোকের এমনই ক্ষমতা যে ইহার সাহায্য লইলে ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুই অলক্ষিত থাকে না। এ চৈতন্য-সাগরে ডুবিতে পারিলে নিজের ব্যক্তিত্ব একবারে বিলুপ্ত হয়। সসীম অসীমে মিশাইয়া যায়। জীবাত্ম-সরিৎ সেই-পরমাত্ম-সাগরে পড়িয়া নিজ অস্তিত্ব-হারা হইয়া পড়ে। যিনি দেখিয়াছেন যে সংসারের সকলই অসার—সকলই ভূয়া—সকলই অনিত্য, তাঁহার পক্ষে এমন শান্তি-তীর্থ আর নাই। যিনি দেখিয়াছেন—যে জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রেম, বন্ধুর ভালবাসা, আত্মীয় স্বজনের স্নেহ, সন্তানের ভক্তি—এ সমস্তই বিবর্ত্তনশীল,—তাঁহার পক্ষে এমন শান্তি-নিকেতন আর নাই। যিনি দেখিয়াছেন যে ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসাতেও ভাঁটা পড়িয়া থাকে, তাঁহার পক্ষে অনন্ত তৃপ্তি লাভের এমন স্থান আর নাই। যাঁহার চিত্ত-বৃত্তি আবার এ সকল কোমলতর-ভাবে সম্প্রসারিত হয় না, তিনি হয় বিষয়-সম্পত্তি—নয় প্রভুতার দাস। কিন্তু তিনিও বুঝিবেন যে ইহাতেও তৃপ্তি নাই—স্থায়ী সুখের আশা নাই। অস্থায়ী ভিত্তির উপর যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, তাহা কখন স্থায়ী হইতে পারে না। অর্থ, বিষয়, প্রভুতা—নিরন্তর পরিবর্ত্তন-শীল! আজ যাহাকে কোটীপতি দেখিতেছ—অদৃষ্ট-চক্রের গতিতে পড়িয়া কাল হয়ত তিনি পথের ভিখারী হইতে পারেন। আজ যাঁহার অধিকার পৃথ্বীতল ব্যাপিয়া পড়িয়াছে, কাল হয়ত, তাঁহাকে মস্তক রাখিবার স্থানের জন্য পরপদলেহন করিতে হইবে। আজ যাঁহার প্রভু-শক্তি জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী দেখিতেছ, কাল হয়ত তাঁহাকে কোন নির্জ্জন দ্বীপে কারাবদ্ধ হইতে হইবে। এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান জগতের যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছ, এই সমস্তই বিবর্ত্তন-শীল। তোমার সুখ শান্তি যদি এই নিত্য বিবর্ত্তন-শীল বস্তুতে আবদ্ধ রাখ, তাহা হইলে তোমাকে নিতাই কাঁদিতে হইবে। নিত্য কেহ কাঁদিতে চায় না, অথচ সকলেই যেন কাঁদিবার জন্যই অনিত্যে আত্ম সমর্পণ করে। যমুনা নদীর চোরা বালিকে যাঁহারা দ্বীপ মনে করিয়া তাহার উপর নামেন, তাঁহাদের

যেমন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ সংসার-রূপ চোরা বালির উপর যাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারা যে কখন্ অতলজলে নিমগ্ন হইবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। তাই বলিতেছি—এস ভাই! সময় থাকিতে থাকিতে আমরা সেই নিত্য নিরঞ্জন ব্রহ্মে আত্মোৎসর্গ করি। এস! আমাদের হৃদয়, প্রাণ, মন—সমস্তই সেই অনন্ত চৈতন্যময়ের চরণে বলি দিই। এস! আমাদের অর্থকাম সেই কামরূপী ইচ্ছাময় ভগবানে উৎসর্গ করি। এস ভাই! আমাদের কর্ম্ম-ফল তাঁহাকে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করি। এ বড় কঠোর সাধনা! কিন্তু ভাই! এ সাধনা ব্যতীতও আমাদের মুক্তির আর দ্বিতীয় উপায় নাই!

অনন্ত স্নেহাধার।

(১২ই মার্চ্চ, ১৮৮১।)

রে অবোধ মন! কেন তুই আজ অনিত্য স্নেহে বঞ্চিত হইয়া কাতর হইতেছিস? যে দাদা তোমাকে এত ভাল বাসিতেন, আজ দেখ—তাঁহার সহিত তোর মত-সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি তোকে অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিলেন। যাহাকে না দেখিলে তিনি মুহূর্ত্তকে প্রহর মনে করিতেন, দেখ আজ তিনি তুই এক খানি পত্র লিখিলেও উত্তর দেন না। শুভাশুভ ঘটনায় তোর আজ সংবাদ পাইবার অধিকারও নাই। তুই যাঁহাদের জন্য এত ব্যাকুল হইতেছিস্, তোর জন্য তাঁহারা আর ব্যাকুল হন না। বলবতী স্বার্থপরতা এক্ষণে তাঁহাদিগকে আসিয়া আশ্রয় করিয়াছে। তাঁহারা সমাজের দাস, সুতরাং তাঁহারা সমাজের তৃপ্তির জন্য হৃদয়কে বলি দিয়াছেন, কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে অতল জলে ডুবাইয়াছেন। রে অবোধ মন! তাই বলিতেছি, তুই কেন আজ অনিত্য স্নেহে বঞ্চিত হইয়া এত কাতর হইতেছিস্! তোর কি কেউ নাই তাই তুই এত কাঁদিতেছিস্? এ মোহ কেন? ঐ দেখ্ তোর অশ্রু-জল মুছাইবার জন্য তোর পার্শ্বে কে দাঁড়াইয়া আছেন! ঐ দেখ্ সেই দিব্য পুরুষ তোকে পূর্ণ স্নেহে ক্রোড়ে লইবার জন্য স্নেহময় হস্ত-যুগল প্রসারণ

করিয়া রহিয়াছেন! এমন সুযোগ আর পাইবি না! একবার নয়ন মেলিয়া দেখ্ তোর নয়ন-রঞ্জন সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। কামধেনু যেমন দুগ্ধস্রাবে সমীপবর্ত্তী বৎসকে উক্ষিত করে, ঐ দেখ্ সেইরূপ অনন্ত-স্নেহাধার সেই দিব্যপুরুষ আজ তোকে নিকটে পাইয়া স্নেহ-জলে তোকে অভিষিক্ত করিতেছেন। তোর ভয় নাই—ভয় নাই—তুই প্রাণ ভরে এই স্নেহ-বারিতে স্নান কর। এ জল যত চাহিবি ততই পাইবি—প্রাণভরে—ও মন প্রাণ ভরে—ইহাতে স্নান কর্। এ যে অনন্ত-স্নেহাধার—এখানে যত স্নেহ চাহিবি তাহার দ্বিগুণ পাইবি—তাই বলি' প্রাণ ভরে স্নান কর্। এ যে মানুষের স্নেহ নয় যে একটু দিয়াই কাড়িয়া লইবে, তাই বলি প্রাণভরে স্নান কর্। ও মন! আজ প্রাণ ভরে স্নান করে চল্—আয় যাই চলে সেই অনন্তধামে, যেথানে স্নেহ দিয়া লোকে কাড়িয়া লয় না।

রাগিণী ঠুংরী। তাল কাওয়ালী।

আমার আর কিছু লাগে না ভাল!

(১৪ই মার্চ্চ। ১৮৮৭।)

(১)

আমার আর কিছুই লাগে না ভাল!
জেনেছি সার সেই নিত্য নিরঞ্জন!
অসার সংসার মাঝে সার ব্রহ্ম সনাতন!
তাই আমি করেছি স্থির, কাটিব এ মায়াজাল!

(২)

ঐ যে বিজলীসমা দারা পার্শ্বে সমাসীনা!
কভু যে সে বরাননা! নহে তোমার আপনা!
যবে হায়! আসিয়া কাল, বল্‌বে তাকে চল—
চলি যাবে সহ কাল—ভুলায়ে তোমায়!

(৩)

দিয়া ফাঁকি হায়২ ! রাখিয়া একাকী তোমায়—
চলে যাবে দিব্য ধাম ! কেঁদে অবিরাম—
তুমি হবে সারা ! যেন ফণী মণিহারা !
শূন্য গৃহে তুমি রবে, কেহ নাহি কথা কবে !

(৪)

ডাকিলে না ফিরে চাবে, হায় ! তুমি চেয়ে রবে !
তবুও তাহারে কেন, বলরে আপন !
এ মায়া-মোহজাল, না আসিতে রে কাল !
ওরে মূঢ় মন আমার, কর ছার খার !

(৫)

যিনি নিত্য নিরঞ্জন, তাঁরে ভুলোনা কখন !
রূপ যৌবন ধন মান, সুখ পরিজন—
কিছু নহে চিরন্তন ! চলে যাবে এইক্ষণ !
এই অস্থায়ি-সকল-বাসনা বিফল !

(৬)

ওরে মূঢ় মন আমার ! কেন রে অসার—
সুখের লাগিয়া দিবে—জলাঞ্জলি শিবে ?
ব্রহ্ম যে শিবধাম ! যেতে স্বর্গধাম—
যদি থাকে রে বাসনা—কর তাঁহার সাধনা।

(৭)

সংসারেরি সুখ যত, ক্ষণে আসে ক্ষণে গত !
সেই অনিত্য সুখের তরে, নিত্যে কেন ভোল !
নির্ব্বাণ পাইবে পরে, শান্তি পাবে নিজ ঘরে !
মন প্রাণ পণ ক'রে নিত্য পূজিলে তাঁহারে।

(৮)

(তাই) ইচ্ছা হয় মুদে নয়ন, দেখি তাঁরে অনুক্ষণ।
তিনি যে আমার প্রাণধন! হৃদয়-রতন!
(হায়!) তুলনা নাহিক তাঁর, এই ভুবন-মাঝার!
দেখিলে তাঁহারে হয় (মরি!) মোর প্রাণ যে শীতল!

রাগিণী কালাংড়া। তাল একতালা।

(আজ) ঘুম ভেঙ্গে কেন দেখিলাম না তাঁরে?

(১৩ই মার্চ্চ, ১৮৮৭।)

(১)

(আজ) ঘুম ভেঙ্গে কেন দেখিলাম না তাঁরে?
(আজ) কেন আমি উঠে, দেখিলাম না তাঁরে?
তিনি যে মোর প্রাণধন! (মরি!) হৃদয়-রতন!
মোর নয়নের মণি! (আর) আনন্দের খনি!

(২)

(ওগো) বল আজ উঠে কেন দেখিলাম না তাঁরে?
সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপ! অতি অপরূপ!
নির্ম্মল-মাণিক-সম—কমনীয়তম!
অপরূপ রূপ! শশী—(যেন) ভূতলে পড়েছে খসি!

(৩)

কি পাপে বলনা ভোরে—আজ দেখলাম না তাঁরে?
হায় প্রাণ কাঁদিতেছে! নয়নে বারি ঝরিছে—
দেখ অবিরল ধারে! না দেখে তাঁহারে!
দেহে নাহি প্রাণ মোর—না দেখিয়া প্রাণেশ্বরে!

(৪)

দেখিতাম নিত্য তাঁরে, দাঁড়ায়ে হৃদিমাঝারে!
ঘুম ভেঙ্গে উঠে ঘরে, একাকী পেয়ে তাঁহারে,
ভাসিতাম আনন্দ-নীরে—ধরিতাম তাঁর করে,
মম হৃদয়ে তাঁহারে—পেষিতাম প্রেমভরে!

(৫)

কিন্তু প্রাণ ফেটে যায়, আজ না দেখে তাঁহায়!
(মোর) মুখে কথা নাহি সরে—সান্ত্বনা কে করে?
(ওগো) জান যদি বল কেন, আজ দেখিলাম না তাঁরে?
জান যদি বল মোরে, কে নিল তাঁহারে হ'রে?

(৬)

আমার হারাণো হীরে, হায় আজ কোন্ চোরে,
হরিল বল আমারে, করিয়া অনাথ মোরে?
উপায় জিজ্ঞাসি কারে—না দেখিয়ে প্রাণেশ্বরে—
অভাগা প্রাণেতে মরে! বলগো কে নিল হ'রে?

(৭)

জলহীন সরোবরে, জল বিনা যথা মীন মরে!
প্রাণ বিনা তথা প্রাণী মরে—তাই ডাকিহে তোমারে!
মরি ধড় ফড় ক'রে, আসিয়া বাঁচাও মোরে!
পতিত-পাবন বিনে—আর কে সন্তাপ হরে?

(৮)

এই যে হৃদয়-দ্বারে—আসিয়া হাজির ওরে!—
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন! কিবা উজ্জ্বল-বরণ!
শক্তি অতিক্রম ক'রে, দেখি আমি আঁখি ভরে,
অধীনের প্রাণেশ্বরে; জগতের অধীশ্বরে!

(৭)

হৃদয় আসন ক'রে, রয়েছি প্রতীক্ষা করে,
এস প্রাণসখা ঘরে, বস আসন-উপরে,
আলিঙ্গিয়া প্রেমভরে, জুড়াইব জীবন রে!
পরীক্ষিব এইবারে, ওহে দয়াল তোমারে!

তোমায় আমায় ভেদ কই?

(১৫ই মার্চ্চ, ১৮৮৮।)

প্রাণেশ্বর! এস একবার প্রাণ ভরিয়া তোমায় আলিঙ্গন করি। একবার আমাতে তোমাতে মিশিয়া এক হইয়া যাই। দ্বৈতভাবে সুখ পাই না। এস! একবার সেই বিশাল অদ্বৈত ভাবে তোমার অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া যাই। শরীরনিবদ্ধ চৈতন্য আমি, আর উন্মুক্ত ও অসীম চৈতন্য যে তুমি, তোমাতে মিশিয়া যাই। ঘট-নিবদ্ধ আকাশ ঘট ভাঙ্গিলে যেমন উন্মুক্ত আকাশে মিশিয়া যায়, তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না; আমিও যদি এই পঞ্চকোষরূপ আবরণ ছিঁড়িয়া বাহির হইতে পারি, তখন আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যাইবে। আমার কোষবদ্ধ চৈতন্য কোষ-মুক্ত হইয়া স্বজাতীয় ভগবচ্চৈতন্যে মিশিয়া যাইবে। তখন মনের সাধে প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া বলিব—"তোমায় আমায় ভেদ কই?"

ঘনীভূত চৈতন্য।

(১৫ই মার্চ্চ, ১৮৮৭।)

ঐ যে সূর্য্য-মণ্ডল আরক্ত নয়নে দিঙ্মণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়া গগণ-ভালে উদিত হইতেছেন, যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কোটী কোটী হিন্দু কর-যোড়ে উপাসনা করিতেছে, উনি কে? বল কেন সেই স্থিরপ্রজ্ঞ তীক্ষ্ণধী সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যঋষিবৃন্দ উঁহার দিকে চাহিয়া ধ্যান-মগ্ন থাকি-

তেন? তাঁহারা কি উহাকে জড়ভাবে পূজা করিতেন? কখন নহে। "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মের" উপাসক আর্য্যঋষিগণ জড়োপাসক হইতে পারেন না। তবে কেন তাঁহারা একাগ্র চিত্তে ঐ তেজঃপুঞ্জের দিকে তাকাইয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। এ প্রশ্নের একই উত্তর। তাঁহারা সূর্য্য মণ্ডলকে ঘনীভূত চৈতন্য বলিয়া মনে করিতেন। চৈতন্য পদার্থ সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বভূতে অনুস্যূত ভাবে বিদ্যমান আছেন। কোন স্থানে বা ইনি ঘনীভূত হইয়া আছেন, কোন স্থানে বা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন এই চৈতন্য সূর্য্যমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঘনীভূত হইয়া আছেন। সুতরাং সেই চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম লাভ করিতে হইলে যথায় সেই চৈতন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঘনীভূত, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্ম-ধ্যান করিলে ত্বরিত ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অধিকতর সম্ভাবনা। সূর্য্য-স্তবেও এই ভাব অতি সুন্দররূপে বিশদীকৃত হইয়াছে।

রাগিণী সুরট-মল্লার। তাল আড়াঠেকা।

মুক্তির উপায় করে দেও।

(১৩ই মার্চ্চ, ১৮৮৭।)

(১)

এস এস প্রাণেশ্বর, বস হৃদাসনে মোর!
দেহ মোরে এই বর—নির্ব্বাণ হয় আমার!
তুমি দীক্ষাগুরু মোর—দুর্দ্দশা আমার ঘোর!
শিক্ষাদানে কর দূর, আমি অজ্ঞান-বিধুর!

(২)

মুক্তিপথ পরিষ্কার, তুমি হে কর আমার—
তুমি বিজ্ঞান-ঈশ্বর! তথা দয়ার সাগর!
নির্গুণ হইয়া তুমি—হও ত্রিগুণ-আধার!
তথা হ'য়ে নিরাকার—হও তুমি হে সাকার!

(৩)

অর্জ্জুনের মোহজাল—তুমি কাটিলে করাল—
জ্ঞান-অসিতে তোমার! হর অজ্ঞান আমার—
হর মোহ-অন্ধকার! তুমি বিনা কে আমার—
হ'বে দীক্ষাগুরু বল—দিয়া শিক্ষা নিরমল!

(৪)

তুমি মম কর্ণধার, যাব আমি ভব-পার!
এই সংসার-সাগর—অনায়াসে হব পার!
সংসার-সাগরে পড়ে, হাবু ডুবু খেয়ে মরে!
জানে তুমি কর্ণধার—তবু নাম লয় না তামার

(৫)

এস কর্ণধার হরি, তুলে লহ তরি' পরি,
তব নাম স্মরি বলি, লোকে দেয় গালাগালি!
বিষম সংসার-ভাব! বিরুদ্ধ মম স্বভাব!
কেমনে বলনা হরি! এ যাতনা হ'তে তরি!

(৬)

জ্ঞাতি বন্ধু প্রভু ভ্রাতা, সবে হ'তে চায় নেতা,
সবে নিয়ে যেতে চায়—নিজ নিজ মতে হায়!
সংঘর্ষ যদ্যপি হ'ল, অমনি সবে বেঁকে গেলো!
বক্ষে পদাঘাত ক'রে, হায় ফেলে দিল দূরে!

(৭)

তাই বলি দেখাও পথ, সিদ্ধ হউক্ মনোরথ!
অনিত্যে ত্যজিয়ে নিত্যে, মিশিগো প্রাণের সাধে
দীক্ষাগুরু হ'য়ে তুমি, ল'য়ে চল মুক্তিভূমি!
আর কিছু চাহি না আমি, নহি আমি স্বর্গকামী!

(৮)

দেও মোরে এই বর—ওহে বিশ্ব-গুরুবর!
নাহি যেন জন্মান্তর—আর হয় গো আমার!
কর হরি যাতে আমি—হইগো তোমার!
আর তুমি নিরাকার—হওগো আমার!

বিনা যোগে প্রাণ কয় দিন বাঁচে?

১৮ই, মার্চ্চ ১৮৮৭।

প্রাণেশ্বর! যেমন পৃথিবীর অভ্যন্তরের সাগরের সহিত পুষ্করিণীর জলের যোগ না হইলে প্রচণ্ড নিদাঘ-তাপে পুষ্করিণীর জল শুখাইয়া যায়, সেইরূপ তোমার সহিত আমার আভ্যন্তরীণ যোগ না হইলে আমারও প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। তুমি চৈতন্য-সাগর—আমি সামান্য চৈতন্য-গোস্পদ! যেমন গোস্পদের জল নিমেষ-মধ্যে শুখাইয়া যায়, সেইরূপ-চৈতন্য-সাগরের সঙ্গে যোগ বিনা আমার ক্ষুদ্র চৈতন্য-গোস্পদ ও সংসারের যন্ত্রণা ও শোক তাপে শুষ্ক হইয়া যায়। প্রাণেশ্বর বিনা আর প্রাণ কয় দিন বাঁচে? তাই, বলিতেছি হে প্রাণেশ্বর ...! প্রাণে প্রাণে যোগ করিয়া দিয়া এ অধীনকে প্রাণে বাঁ... ...ও। এমনই একটী নল বসাইয়া দেও, যেন তোমার চৈ... ...ন্যসাগর হইতে অনবরত চৈতন্য-জল আসিয়া আমার ... ...প্রাণ-পুষ্করিণীকে সদা পূর্ণ রাখে! ইহা অপেক্ষা অধিক প্রার্থ... ...না আমার আর নাই!

ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি!! ওঁ স্বস্তি!!!

প্রাণ কাঁদে যে আমার, না দেখে তোমায়!

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়াঠেকা।

(১৮ই মার্চ্চ, ১৮৮৭।)

(১) প্রাণ কাঁদে যে আমার, না দেখে তোমায়!
বল নাথ! কি করি উপায়?
হুহু ক'রে জ্বলে প্রাণ, যেন দাবানল!
হায়! এ যে বিষম অনল!

(২) অবিরাম জ্বলে প্রাণ চিতানল-সম!
কিন্তু কভু ভস্ম নাহি হয়!
সুবর্ণ অনলে গলি, উজ্জ্বলতা পায়!
আহা কিবা সুন্দর নিয়ম!

(৩) খনিজ মাত্রেরি ধর্ম্ম—আগুণে তাতালে,
মলামাটী যত পুড়ে যায়!
জীবাত্মারো ধর্ম্ম এই—ইহারে পোড়ালে,
পুড়ে ব্রহ্মানলে, পূত হয়!

(৪) মলামাটি গেলে হয়—উজ্জ্বল-বরণ!
হায় কিবা নয়ন-মোহন!
ব্রহ্মতেজোদীপ্ত আত্মা—শত-সূর্য্য-সম!
তবু যেন কমনীয় সোম!

(৫) উপেক্ষিয়ে ব্রহ্মতেজে—হয়েছিলা ভস্ম—
সগর-সন্ততিগণ হায়!
ব্রহ্মতেজোবলে শরশয্যাস্থিত ভীষ্ম—
লভেছিলা মরণ ইচ্ছায়!

(৬) তাই ডাকিহে তোমায় !—ওহে জ্যোতির্ম্ময় !
ব্রহ্মজ্যোতিঃ দেওহে আমায় !
ব্রহ্মজ্যোতিঃ পেয়ে যেন—হইগো অমর !
ওহে দেহ মোরে এই বর !

(৭) দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ—ওহে জগত-প্রাণ !
তু-বিনা আঁধার এই ধরা !
পুকুরে শুখালে জল, কেমনে শফরী-দল—
বাঁচিবে বল ? পড়িবে মরা !

(৮) (সেইরূপ) প্রাণ-সরোবরে না থাকিলে ব্রহ্মজল—
আমি বাঁচিব কেমনে বল ?
জীবমীন প্রাণসরোবরে মরে গো জল শুখালে !
পূরাও চিৎ তাই ব্রহ্মজলে !

(৯) হায় ! মোর প্রাণসরোবর, বুঝি আজ শুষ্ক হয় !
তুমি বিনা ওহে নিরদয় !
বরষিয়ে শান্তি-বারি—হর হে তাপ অপার !
কর শীতল প্রাণ আমার !

(১০) হও তুমি আবির্ভূত, মম চিদাসনে—
এস ! ওহে ব্রহ্ম দয়াময় !
তুমি আমি হব এক—অপূর্ব্ব মিলনে !
পাব মুক্তি তোমার কৃপায় !

(১১) কবে সেই শুভ দিন, আসিবে আমার—
ভুঞ্জিব হে আনন্দ অপার !
ঘুচিবে আমিত্ব মোর, হইব তোমার !
আর তুমি হইবে আমার !

(১২) চাহিনা স্বর্গের সুখ, চাহি না কাহায়!
বিনা একমাত্র হে তোমায়—
চাহি না কিছুই আমি! চাহি সেই জন—
নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধ নিরঞ্জন!

(১৩) এ কামনা ত্যাগ আমি করিতে না পারি!
জাননা কি তিনি যে আমার!—
আমি যে তাঁহারি!—তবে কেমনে তাঁহায়—
ছাড়িয়া বাঁচিব হায়!

নমো ব্রহ্মণে! নমো বিশ্বরূপায়!

(১৯শে মার্চ্চ, ১৮৮৭।)

হে বিশ্বরূপ ব্রহ্ম! ঐ যে সূর্য্যমণ্ডল দেখিতেছি—উহা তোম হৃৎপিণ্ড! উহা হইতে যে বিদ্যুৎ ও তন্নুপ অবিরাম বিনির্গত হইয়া জগ গুলকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করিতেছে—সেই বিদ্যুদ্দাম ও তন্ন রাজি তোমার শিরা ও ধমনী-মণ্ডল। সেই শিরা ও ধমনীমণ্ডলী তারযোগে তুমি তোমার চৈতন্যময় স্বরূপ প্রেরণ করিয়া বিশ্বের সা অনুস্যূত ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছ—ও জগৎকে চৈতন্যময় করিয়া রা য়াছ। তোমার হৃৎপিণ্ডে দুইটী স্থলী আছে। একটীতে বিশুদ্ধ পবিত্র বিদ্যুৎ ও তন্নুপ সঞ্চিত আছে, এবং অন্যতর স্থলীতে অবিশু দূষিত বিদ্যুৎ ও তন্নুপ অনবরত গৃহীত হইতেছে। সূর্য্যমণ্ডল-স্থ হইতে দূষিত বিদ্যুৎ ও তন্নুপ, কিরণ-যোগে অনবরত আকর্ষণ করি ছেন, এবং সেই কিরণ-যোগেই আবার বিশোধিত বিদ্যুৎ ও তন্নুপ বরত প্রেরণ করিয়া জগৎমণ্ডলকে নিরন্তর সজীব রাখিয়াছেন। এই কেবল এই বিদ্যুৎ ও তন্নুপের সংপরিহরণ ও সংপ্রসারণ, এবং নোর সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের খেলা মাত্র। তুমি একই দেহী, ও আত্মা—সংপরিহরণ ও সংপ্রসারণ এবং সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের বৈচি

নানা রূপ ধারণ করিতেছ। আমরা মূর্খ, তাই তোমায় বুঝিয়া উঠিতে পারি না।—তাই আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। তাই আমার আমার বলিয়া হতজ্ঞান হই। কই আমি বলিয়াত একটা স্বতন্ত্র পদার্থ তত্ত্ব-জ্ঞানের চক্ষে দেখিতে পাই না। ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় যে সকলই একাকার দেখি। উন্মীলিত জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে বিদ্যুৎ, তদ্রূপ ও চৈতন্য মিশিয়া যেন এক অখণ্ড তেজঃপুঞ্জরূপে আবির্ভূত হয়। সেই বিশাল অসীম তেজোমণ্ডলের কেন্দ্রীভূত হইয়া ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় আমি যে আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না। হে বিশ্বরূপ তখন যে তোমার হৃৎপিণ্ড আসিয়া আমার হৃৎপিণ্ডে মিশিয়া যায়! তোমার শিরা ও ধমনী-মণ্ডলের সহিত আমার শিরা ও ধমনীমণ্ডলের যোগ হইয়া এক বিশাল শিরা ও ধমনীমণ্ডলের প্রণালী আবির্ভূত হয়। তোমার চৈতন্য-স্বরূপ আমার চৈতন্য-স্বরূপে মিশিয়া এক অখণ্ড চৈতন্য-সাগর উৎপাদন করে। তখন অনুভব হয় যেন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার সহিত সেই অখণ্ড চৈতন্যসাগরে ডুবিয়া নিজ নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়াছে। একেই বোধ হয় পিতৃগণ "সোঽহং জ্ঞান" বলিয়া গিয়াছেন। হে বিশ্বরূপ! সত্যই তখন বোধ হয় আমিই তুমি হইয়াছি। যথা আমি নাই—তুমিই নিত্য সত্ত্বা বিদ্যমান রহিয়াছ। অথবা যেন আমি বিলয়ভাবাক্রান্ত হইয়া 'তুমি আমি' এ তুলনাজ্ঞান একেবারে হারাই। হে বিশ্বরূপ! যখন তুমিই একমাত্র নিত্য সত্ত্বা—তখন তুমি মোহ-জনিত স্বতন্ত্র সত্ত্বার জ্ঞান বা অজ্ঞান দিয়া কেন বিড়ম্বিত করিতেছ? যে বিলয়ভাবে ধ্যানাবস্থায় আমি ব্যক্তিগত অস্তিত্ব হারাইয়া যাই—সেই আত্ম-জ্ঞান-বিলোপী তত্ত্বজ্ঞানের সত্ত্বা আমি বিনা ধ্যানে অনুভব করিতে পারি না কেন? হে দেব! তোমা হইতে মধ্যে মধ্যে বিশ্লিষ্ট হই কেন? আজও নিত্য-যুক্ত হইতে পারিলাম না কেন? স্বতন্ত্র অস্তিত্বে আমি আর সুখ পাইতেছি না জানিয়াও তবু আমায় ফেলিয়া মধ্যে মধ্যে তুমি পলায়ন কর কেন? হে বিশ্বরূপ! হে সনাতন ব্রহ্ম! হে নিত্য সাক্ষী! হে নিরঞ্জন! তোমাকে কি বলিয়া ডাকিলে নিত্য আমার সহিত মিলিত থাকিবে, তাহা শিখাইয়া দেও।

আমি তাই বলিয়া তোমায় ডাকিব।" "আমি অনেক দিন হইতে গুরু খুঁজিতেছি, কিন্তু আমার অদৃষ্টে গুরু মিলিল না। তোমার সহিত নিত্য-যুক্ত করিয়া দিতে সক্ষম এমন গুরু-ত দেখিতে পাইলাম না। তাই আজ তোমার চরণে শরণ লইয়াছি। হে বিশ্বরূপ! হে বিশ্বনাথ! হে দীনবন্ধু! হে অধমতারণ! তুমিই আমার গুরু হইয়া তোমাতে আমি যাহাতে নিত্য-বিলীন হইতে পারি তাহা শিক্ষা দেও। আর কোথায় যাইব? তুমিই জীবের শেষ গতি। তাই তোমার চরণে শরণ লইলাম, এখন যাহা ইচ্ছা তাহাই কর নাথ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক্।

বিভিন্ন দর্শন।

(২০শে মার্চ্চ ১৮৮৭।)

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি! তোমার অদ্ভুত লীলা বুঝিয়া উঠি আমার এমন সাধ্য কি? তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করার পর হইতে আমার দর্শন সাধারণের দর্শন অপেক্ষা বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সাধারণ লোকে যে বস্তু যে ভাবে দেখে, আমি তাহা তদ্বিপরীত ভাবে দেখিতে পাই। আমি দেখিতেছি আমরা সকলেই ক্রীড়া-পুত্তলী এবং তুমিই একমাত্র খেলক। পুত্তলীনৃত্যের সময় যেমন খেলক উপর হইতে তার-সংযোগে পুত্তলীগণকে যথেচ্ছ চালিত করে, তুমিই সেইরূপ তোমার প্রকৃষ্ট চৈতন্যময় বিদ্যুত্তারে বাঁধিয়া আমাদিগকে যথেচ্ছ সঞ্চালিত করিতেছ। স্বর্ণকার যেমন শলাকার দ্বারা সুবর্ণকণাগুলিকে অলঙ্কারের যথা স্থানে বিনিয়োজিত করে, তুমিও সেইরূপ প্রত্যেক পরমাণু হইতে স্থূলতম জড় জগৎকে—অতীন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সকলকেই—নিজ-চৈতন্যানুপ্রাণিত বিদ্যুচ্ছলাকা দ্বারা আপন ইচ্ছামত যথাযথ বিনিয়োজিত করিতেছ। অথচ সকলেই ভাবিতেছে যে সে আপন স্বাধীন ইচ্ছায় কার্য্য করিতেছে! কি মোহ! কি ভ্রান্তি! যাহার অন্তর হইতে ভ্রম ও মোহ চলিয়া যাইবে, তিনিই জগৎকে বিভিন্ন দর্শনে দেখিতে আরম্ভ করিবেন। তিনি তখন সকল কার্য্যেই তোমার হাত দেখিতে পাইবেন। দেখিতে পাইয়া স্থির ও গম্ভীরভাবে তোমার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবেন। তখন

তাঁহার স্বতন্ত্র কার্য্যের স্পৃহা থাকিবে না। তোমার আদেশ প্রতিপালন করা ভিন্ন তাঁহার আর কোন কার্য্য থাকিবে না। যেমন টেলিগ্রাফ্ মাষ্টার টেলিগ্রাফের ব্যাটারীর দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া—কখন কি সংবাদ আসে তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন, সেইরূপ ব্রহ্মোৎসৃষ্ট-প্রাণ সাধু নিজ চিত্তশলাকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া—তোমার আদেশের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন। তোমার তাড়িত নলের ভিতর দিয়া চৈতন্য আসিয়া যখন আমার চিত্ত-শলাকাকে স্পর্শ করে, তখনই আমি অনুপ্রাণিত হইয়া তোমার আদেশ হৃদয়-ফলকে লিখিয়া লই। তখনই আমার কর্ম্মে অধিকার জন্মে। তোমার সেই আদেশ প্রতিপালনই আমার একমাত্র কর্ম্ম। যতক্ষণ সে আদেশ না আসে—ততক্ষণ আমি সমাধিস্থ থাকি। যাঁহারা এ অবস্থা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা আমায় পাগল বলেন। শান্তি-পাগলকে পাগল বলিয়া—গালি দিয়া তাঁহারা প্রকারান্তরে তাহার স্তুতিই করিয়া থাকেন। শান্তি-পাগলের লক্ষ্য ব্রহ্মে নির্ব্বাণ—লোকের লক্ষ্য সুখ সম্পদ কীর্ত্তি যশ—মান মর্য্যাদা। শান্তি-পাগল এ সকল কিছুই চাহে না—চাহে কেবল অনন্ত শান্তি! সুতরাং শান্তি-পাগলের দর্শন ও লোক-সাধারণের দর্শন বিভিন্ন হইবে ইহাতে বিচিত্রতা কি? ওঁ শান্তিঃ! শান্তি! শান্তি!

নমস্তে উদ্ধার-কর্ত্রে।

(২১এ মার্চ্চ, ১৮৮৭।)

হে পতিতপাবন পরমেশ্বর! আজ তোমারই প্রসাদাৎ আমি এই নরজীবন লাভ করিয়াছি। আজ তোমারই কৃপায় আমি এই সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি। আজ আমি প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। শৈশবে ও বাল্যে যখন বিশ্বাস ও ভক্তির রাজ্যে বিচরণ করিতাম—সেই এক অপূর্ব্ব শান্তির সময় ছিল। তখন সকল বিষয়েই আপনাকে তোমার অনুগৃহীত বলিয়া মনে করিতাম। তোমার সাহায্য আহ্বান না করিয়া কোন কার্য্যই প্রবৃত্ত হইতাম না। আজ সেই

পবিত্র রাত্রি—যে ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে—ব্যাঘ্র ও বন্যশূকরসঙ্কুল বরিশালারণ্যে প্রবেশ করিয়া বটবৃক্ষতলে বসিয়া অষ্টমবর্ষীয় বালক যখন ধ্রুবের ন্যায় তোমায় পদ্মপলাশলোচন বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া ছিলাম—সেই পবিত্র রাত্রি এখন কি উজ্জ্বল-রূপে স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইতেছে। আবার তার পর নবম বর্ষে উপনীত হইয়া যখন অতি ভক্তিভাবে আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচারি রূপে তোমার উপাসনায় নিযুক্ত হইয়া ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করি, সেই পবিত্র কাল কি মোহন-রূপে আমার স্মৃতি-পথে আরূঢ় হইতেছে। তাহার পর পঞ্চদশ বর্ষ হইতে এক-বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত—উপনিষদ্ ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র-ছায়ায় সমাসীন হইয়া তোমায় যখন নিরন্তর ডাকিয়াছিলাম, সে সব দিনই বা আজ কি পবিত্র মূর্ত্তিতে স্মৃতি-সমারূঢ় হইতেছে। এক-বিংশতি হইতে ত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত আমার জীবনের দার্শনিক বা বৈপ্লবিক কাল। উপর্য্যুপরি শোকাবেগে যখন আমার ভক্তি ও বিশ্বাসের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তখন প্রাণেশ্বর! তোমার উপর ঘোর অভিমান জন্মিয়াছিল। ভাবিলাম তোমার চরণে আমি যখন আত্মোৎসর্গ করিয়াছি—তখন আমায় পুনঃ পুনঃ যাতনা দিয়া তোমার কি সুখ হইতেছে। তখন তোমার অনন্ত-দয়াবত্তা ও অনন্ত-শক্তিমত্তার সামঞ্জস্য করিতে পারিলাম না। কুতর্ক উপস্থিত হইল এই যে যদি তুমি সত্যই অনন্তদয়াবান্ ও অনন্তশক্তিমান্—উভয়ই হইবে, তবে তুমি ভক্তের দুঃখ নিবারণ করিতে পার না কেন? আর যদি ভক্তকে পুনঃ পুনঃ দুঃখ ও শোক-সাগরে ডুবাইতে তুমি সুখ মনে কর, তাহা হইলে তুমি নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয়। সুতরাং যিনি নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয়, তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিব কেন? আর যদি তুমি প্রকৃত দয়াবান্ হও, কিন্তু শক্তির অভাবেই ভক্তের দুঃখ দূর করিতে অক্ষম হও, তাহা হইলে তুমিই যখন কৃপার পাত্র, তখন তোমার শরণ লইয়া লাভ কি? এই সকল কুতর্ক আসিয়া আমাকে মোহজালে আচ্ছন্ন করিল। দুরন্ত মোহ তত্ত্বজ্ঞানকে কলুষিত করিল। সে মোহ তখন আমাকে বুঝিতে দিল না যে স্বর্ণকার যে সুবর্ণকে গলিত

করে—সে কি সুবর্ণকে নষ্ট করিবার জন্য, না তাহার মলিনতা দূর করিবার জন্য। তখন বুঝিতে পারিলাম না যে তুমি যাহাকে ভাল বাস—যাহাকেই উদ্ধার করিতে চাও—তাহাকেই পুঞ্জীকৃত শোক ও দুঃখ প্রদান কর। শোক ও দুঃখের অগ্নিতে দগ্ধ না হইলে আত্মার মলিনতা বিদূরিত-হয় না! যে শোক দুঃখ পায়, সে যে তোমার অনুগৃহীত—মোহ আমায় ইহা বুঝিতে দিল না। তাই অজ্ঞান-বশতঃ সে সময় তোমার ধ্যান—তোমার চিন্তা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু হৃদয়ের শুষ্কতা প্রতিনিয়ত অনুভব করিতাম। সেই জন্য হৃদয়ের যে স্থান তুমি অধিকার করিয়াছিলে, সেই স্থানে মানবদেবীকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলাম। মানবপ্রেম আসিয়া এই সময় ভগবদ্ভক্তিনিকেতন অধিকার করিয়াছিল। তত্ত্বজ্ঞানকে ছাড়িয়া দিয়া অতঃপর কর্ম্মকেই জীবনের লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু দুগ্ধের তৃষ্ণা কি কখন ঘোলে মিটিয়া থাকে? সাগরের উপকূলে থাকিয়া কি কখন সরোবরের জলে প্রাণ শীতল হয়? তাই আবার আসিয়া তোমার চরণ-তলে আশ্রয় লইয়াছি! তুমি ধীরে ধীরে সেই ঘোর মোহজালের ভিতর দিয়া আমাকে আবার তোমার আলোকময় রাজ্যে আনিয়াছ! ভ্রাতার বিদেশে অবস্থিতি-কালে—যখন আমি চিন্তায় আকুল হইতাম—তখন তুমি আমাকে হস্তাবলম্বন দিয়াছিলে। অযাচিত হইয়াও আমার নিমগ্নপ্রায় তরীর কর্ণধার হইয়াছিলে! সেই ময়মনসিংহের ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে তুমিই আমার ও আমার প্রাণ-পুত্তলীগণকে উদ্ধার করিয়াছ। সেই বিশাল কুম্ভীর-পরিপূর্ণ শীতলাক্ষীর জলে নৌকা-ডুবি হইয়া যখন ভাসিতে ভাসিতে আমি কোথায় যাইতেছিলাম, তখন তুমিই আমার পার্শ্বে থাকিয়া আমায় রক্ষা করিয়াছিলে। আবার সেই ভীষণ ভূমিকম্পের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমায় রক্ষা করিবার জন্যই যেন আমার উপবেশন-স্থান হইতে আমায় তুলিয়া লইয়া গেলে। আমি উঠিলাম আর সেই স্থানের ছাদ খসিয়া পড়িল! এ সমস্ত কার্য্যে তোমাকে আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম। সুতরাং আমার মোহ কাটিয়া গেল! প্রাণবল্লভ! আর তুমি আমায় ভুলাইতে পারিবে না! তোমার খেলা বুঝিয়াছি। আর সে খেলায় আমার বিশ্বাস ও ভক্তি বিচলিত

করিতে পারিবে না! আর সন্দেহ-মেঘে আমার জ্ঞান-সূর্য্যকে আবৃত করিতে পারিবে না। হে কুহকী! আর তোমার কৌশল আমার কাছে খাটিবে না। ছি! দুর্ব্বল পাইয়া কি ভক্তকে এরূপ নাস্তানাবুৎ করা তোমার উচিত ছিল? অথবা তোমার কৌশল, তোমার খেলা তুমিই বুঝিতে পার! সে কৌশল, সে খেলা বুঝে এমন শক্তি কার আছে? ভক্তকে পরীক্ষা করিবার জন্য বা উদ্ধার করিবার জন্য—তুমি এ খেলা অনেকবার খেলিয়াছ—এ কৌশল অনেকবার অবলম্বন করিয়াছ! তথাপি মূঢ় আমি ইহা বুঝিতে পারি নাই! নমস্তে মহামহিম্নে!

——

নমস্তে দীনবন্ধবে!

(২২শে মার্চ্চ, ১৮৮৭।)

হে অনাথ-নাথ! যাহাকে সকলেই পরিত্যাগ করে তুমি সেই ভক্তকেই অগ্রে ক্রোড়ে তুলিয়া লও। যেমন সন্তানকে আর কেহ অযত্ন করিলে, জনক জননীর প্রাণে ব্যথা লাগে, সেইরূপ তোমার সন্তানকে কেহ অযত্ন করিলে, তোমারও প্রাণে ব্যথা লাগে। তুমি তখনই তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন কর—সান্ত্বনা-বাক্যে তাহার কাতর প্রাণকে শীতল কর। যে পরিমাণে তাহাকে অপরে ঘৃণা করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে তুমি তাহাকে আদর করিয়া থাক। পাপী—তাপী—দীন—দুঃখী—কাণ—খঞ্জ—অন্ধ—আতুর,—এই জন্য তোমার অতি আদরের সামগ্রী। জগৎ তাহাদিগের দিকে তাকায় না বলিয়াই তোমার স্নেহ-দৃষ্টি তাহাদিগের উপর সর্ব্বদা পড়িয়া আছে। তুমি তাহাদিগকে রক্ষা না করিলে—তাহারা এক দিনও বাঁচিতে পারে না। তুমি তাহাদিগকে সান্ত্বনা না দিলে তাহারা তাহাদিগের দুর্ভর জীবন কখনই বহন করিতে পারেনা। এই জন্যই তোমার নাম দীনবন্ধু হইয়াছে। এই জন্যই গীতায় লিখিত আছে যে আর্ত্তও তোমাকে পাইয়া থাকে। এই জন্যই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন যে "আমি কেবল বিপদই কামনা করি, কারণ তাহা হইলে আমি দীনবন্ধুকে সর্ব্বদা পার্শ্বে পাইব।"

এই জন্যই সাধুগণ দীন দুঃখীকে সমস্ত দান করিয়া আপনাদিগকে দীন দুঃখীর শ্রেণীভুক্ত করেন! কারণ দীনহীন কাঙ্গাল না হইলে তোমায় পাওয়া যায় না। এই জন্যই মহর্ষি ক্রাইষ্ট বলিয়াছিলেন যে যদি পিতার রাজ্যে আসিতে চাও ত তোমার সমস্ত ধন সম্পত্তি দীন দুঃখীকে দান করিয়া আইস! হে দীননাথ! হে ভক্তবৎসল! তাই আমি আমার যথা সর্ব্বস্ব তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়া দীন দুঃখী হইয়া তোমার নিকট দাঁড়াইয়াছি। তুমি আমায় পদাশ্রয় দিয়া দীনবন্ধু নামের সার্থকতা কর।

কৌশল তোমার বুঝিতে না পারি।

(২৩শে মার্চ্চ. ১৮৮৭।)

হে বিশ্বরূপ! তোমার জটিল কৌশলের ভিতর প্রবেশ করি—এমন সাধ্য আমার নাই, তুমি যে কি অভিপ্রায়ে কোন্ কাজ করিতেছ—তাহা মূঢ় মানব আমি কেমনে বুঝিব? তবে এই মাত্র বিশ্বাস যে তুমি সর্ব্বমঙ্গলময়। সুতরাং তোমার অভিপ্রায় মঙ্গলময়ই হইবে। এই বিশ্বাসেই ভক্তের মনে শান্তি উদিত হয়। তথাপি কৌতূহল নিবৃত্ত হইবার নহে। তোমার অভিপ্রায় জানিবার পিপাসা স্বভাবতঃই অতিশয় বলবতী। তাই আজ নাথ! তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—বলিয়া দেও, কেন আমায় আজও সংসারে রাখিয়াছ? আমি পদ্মপত্রের উপরের জলের ন্যায় সংসার-পদ্মপত্রের উপর ভাসিতেছি। আমি মিশ খাইতেছি না—সংসারও আমার সহিত মিশিতে পারিতেছে না,—আমিও সংসারিকতায় নামিতে পারিতেছি না—সংসারও আমার সহিত উঠিতে পারিতেছে না। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আমাকে বিষয়-বুদ্ধি-রহিত বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। আমিও তাঁহাদিগকে বিষয়-কীট বলিয়া মনে করিতেছি তাঁহারা আমাকে কাজের বাহির বলিয়া মনে করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে অজ্ঞান কর্ম্মী বলিয়া মনে করিতেছি। তাঁহারা আমাকে যে

পথে যাইতে বলেন তাহা আক্ষরিক আইনের পথ—বিষয়ের পথ। আমি যে পথ দিয়া যাইতে চাই, তাহা ধর্ম্মের পথ—আইনের ভিত্তির পথ—ইহার উপরের পথ। সুতরাং পরস্পর-সংঘর্ষ অনিবার্য্য। তাঁহারাও আমায় টানাটানি করিয়া নাবাইবার চেষ্টা করিতেছেন—আমিও তাঁহাদিগকে টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আত্মাভিমানের ভরে তাঁহারা কিছুতেই উঠিতে পারিতেছেন না। এদিকে আমিও নামিতে পারিতেছি না। বলিয়া দেও দেব! এ বিড়ম্বনার অবস্থা আর কত দিন থাকিবে? তুমি ইহাঁদিগকে আমার কাছে আনিয়া দেও, নাথ! যদি তাহা অসম্ভব হয় তাহা হইলে যে সহানুভূতি-শৃঙ্খলে আমি তাঁহাদিগের সহিত আবদ্ধ রহিয়াছি, সেই শৃঙ্খল কাটিয়া দেও। আমি উন্মুক্ত পক্ষীর বা ছাড়িত ফানসের ন্যায় উড়িতে উড়িতে তোমার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই। অথবা তুমি বিশ্বরূপ ও বিশ্বব্যাপী, তোমার রাজ্য সর্ব্বত্র। সুতরাং শিকল কাটিয়া দেও—আমি উন্মুক্তভাবে তোমার বিশ্বরাজ্যে পর্য্যটন করিয়া বেড়াই! একবার অনিকেত হইয়াও বিশ্বনিকেত হইয়া বেড়াই। এক-বার আমায় ভুলিয়া বিশ্বকে আমার বলিয়া ডাকিয়া লই! মনের সাধে একবার প্রাণ ভরিয়া সকলকেই ভাই বন্ধু বলিয়া ডাকি। ঐ যে বালুকা-কণা সূর্য্যের উত্তাপে ঝক্ ঝক্ করিতেছে—উহাতেও তোমার শক্তি ও চৈতন্য নিহিত রহিয়াছে। পরমাণু হইতে স্থূলতম গিরিরাজি, ও কীটাণু হইতে দেবতা পর্য্যন্ত—সকলই অল্প বেশী তোমার শক্তি ও চৈতন্যে অনুপ্রাণিত। সুতরাং তাহারা সকলেই আমার ভাই বোন্—অথবা তাহারা সকলেই আমি—কারণ তুমি আমি অভিন্ন। তুমি অঙ্গী—আমি অঙ্গ। অথবা তুমি আমি দুইএ জড়িত হইয়া—কখন অঙ্গ—কখন অঙ্গী। হে বিশ্বনাথ! যে সংসার-বন্ধন এই বিশ্বভাব ও বিশ্বপ্রেমের বিরোধি—তুমি আমার সেই বন্ধন কাটিয়া দেও, আমি উন্মুক্ত হইয়া গগনবিহারী বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ করি।

কেন রে অবোধ মন ! মরণে কর রে ভয় ?

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

(২৮শে মার্চ্চ, ১৮৮৯।)

(১)

কেন রে অবোধ মন ! মরণে কর রে ভয় ?
জনম মরণ হয়, সংসারেরি পরিণাম !
চিরস্থায়ী নাহি হয়, কিছু এ মর ধরায় !
এসেছি যেতে গো হবে, বল কেন তবে ভয় ?

(২)

বিশ্বরূপ ব্রহ্মময়—সকলি এই ধরায় !
মরিলে যাইব কোথা, ছাড়িয়া বল তাঁহায় ?
জীবনে মরণে তিনি, মোর একই সহায় !
জীবন মরণ শুধু—তাঁর রূপান্তর হয় !

(৩)

মন ! তবে কেন ভয় ?—বল কারে কর ভয় ?
যাঁহার কোলেতে তুমি, ছিলে এতদিন ধরায় !
তাঁহারি কোলেতে যাবে, যদি এ জীবন যায় !
যেহেতু কীটানু নর, ব্রহ্ম-রূপান্তর হয় !

(৪)

সকলি তাঁহার যবে, যেখানে তবে যাহায়—
রাখিতে চাহেন তিনি, ওগো সেই স্থান হয়—
উপযুক্ত তার পক্ষে, মন জানিবে নিশ্চয় !
তবে রে আকুল কেন, তুই মরণ-চিন্তায় ?

(৫)

জনম উৎকৃষ্টতর, পাবে ব্রহ্মের কৃপায়—
অথবা সঞ্চিত যদি, ক'রে থাক পুণ্যচয়!
শাস্ত্রের লেখন এই, মন! ডাকিলে তাঁহায়—
মৃত্যুকালে একবার, পাপী তাপী মুক্তি পায়!

(৬)

কিসের ভাবনা তবে?—কর মৃত্যুভয় জয়!
নাহি যার মৃত্যুভয়—সেই হয় মৃত্যুঞ্জয়!
বারে বারে মরে সেই, মরণে যে ক'রে ভয়!
একবার মাত্র জেন, বীরের মরণ হয়!

(৭)

তাই বলি নাহি ভয়, যাইতে হে ব্রহ্মালয়!
প্রফুল্ল অন্তরে হও, প্রস্তুত যেতে তথায়!
ভক্তের পক্ষেতে তাহা—হয় অমৃত-আলয়!
ডাকিতে ডাকিতে তাঁকে, চল হইয়া নির্ভয়!

(৮)

কত সঙ্গী পাবে তথা, যারা ফেলিয়া তোমায়—
গিয়াছে চলিয়া হায়!—তব অগ্রেতে তথায়!
বহুদিন দেখ নাই—তুমি যে মুখ-কমল—
দেখিবে কমল সেই—উজ্জ্বল সুষমাময়!

(৯)

প্রাণাধিকা দারা সুতা, তথা পুত্র পিতৃগণ!
দেখিবে সকলে তথা, হ'য়ে উৎসুক-নয়ন!
তাকায়ে সকলে তারা, রবে হ'য়ে আত্মহারা!
আনন্দে গাইবে সবে—'জয়! ব্রহ্ম দয়াময়!'

(১০)

'জয় ব্রহ্ম দয়াময়! মোরা তোমার কৃপায়!
কত দিন পরে হায়! মিলিলাম গো হেথায়!
কৃপা ক'রে এই বর, দেহ এবে দয়াময়!
মোদের মিলনে আর, যেন বিচ্ছেদ না হয়!'

(১১)

নারদাদি ঋষিগণ, হ'য়ে প্রফুল্ল-আনন,
করিবেন আলিঙ্গন, স্নেহে মোদের তথায়!
ধনী দীন রাজা প্রজা—সকলে সমান হয়—
হায় নয়নে তাঁদের!—ধর্ম্মেরি কেবল জয়!

(১২)

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির!—রাম রঘুমণি বীর!
ঈশা মহম্মদ ভীষ্ম, বুদ্ধ চৈতন্য বিদুর!—
সকলে কোলেতে ল'য়ে, দিবে সান্ত্বনা তোমায়!
শান্তি-বারি দিবে ঢেলে, তব অন্তর-জ্বালায়!

(১৩)

পাপী ব'লে নাহি ঘৃণা; তাপী না পায় যন্ত্রণা!
প্রেমের সাধনা শুধু—মন! দেখিবে তথায়!
পরস্পর নিন্দা ক'রে—সুনাম না লয় হ'রে!
আলিঙ্গন প্রেমভরে, সকলে করে সবায়!

(১৪)

কি সুখে রয়েছ ভবে, বল রে অবোধ মন!
থাকিতে ইহাতে তব, তাই এত আকিঞ্চন!
বৈষম্যে বিষাক্ত ধরা, স্বর্গধাম সাম্যে ভরা!
নাহি গো অকালে মরা!—চির-অমৃত-আলয়!

(১৫)

এমন সুখের স্থানে—থাকিতে এ ভোগ কেন ?
দাসত্ব-যন্ত্রণা হেন—কেন ভুঞ্জি এ ধরায় ?
ব্যক্তি-জাতি-গত দুঃখ, নিত্য সহ্য নাহি হয় !
দাসের জীবন হায় ! ত্যজিতে কেন গো ভয় ?

(১৬)

শান্তি-নিকেতনে চল—পাবে শান্তি নিরমল !
জুড়াবে জ্বালা-সকল—হায় যাইলে তথায় !
(ওরে)মন ! তবে কেন ভয় ?—ব্রহ্ম হইলে সদয়—
যাবে তব দুঃখ সব !—তাই চল ব্রহ্মালয় !

—o—

সে পরীক্ষানলে সোণা হইবে উজ্জ্বল !

(২৬শে মার্চ্চ, ১৮৮৭।)

হে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম ! তুমি নিরন্তর আমার সহিত মিশিয়া আছ, কিন্তু আমি সকল সময় তোমার সহিত মিশিতে পারি না কেন ? তুমি তৈল আমি জল—তুমি উপরে ভাসিতেছ, আমি তলে পড়িয়া আছি। গায় গায় মিশিয়া রহিয়াছ জানিতেছি—অথচ আমি মিশিয়া যাইতেছি না কেন ? যখন তোমায় একাগ্র চিত্তে ধ্যান করি, কেবল সেই সময় মাত্র তোমার সহিত মিশিয়া যাই। অন্য সময় মিশিয়া যাই না কেন ? ধ্যানাবস্থায় তৈল জল হইয়া জলে মিশিয়া যায়, বা জল তৈল হইয়া তৈলে মিশিয়া যায়। তখন অদ্বৈতভাবের পূর্ণ আবির্ভাবে দ্বৈতভাব একেবারে চলিয়া যায়। অতি মহান্ অদ্বৈতভাব আসিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কুক্ষিগত করিয়া ফেলে। তখন আর আমার আমিত্ব থাকে না। তখন আমি তোমার বিশ্বরূপের অন্তর্গত হইয়া যাই। তখনই আমি "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিতে সক্ষম হই। তখনই আমি "সোঽহম্"

জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী হই। কিন্তু প্রভো! এ ভাব আমার চিরস্থায়ী হয় না কেন? ধ্যানাবস্থা ব্যতীত অন্য সময় এ অদ্বৈতভাবের স্ফুরণ হয় না কেন? আমি চক্ষু নিমীলিত করিয়া বিশ্বব্যাপী অদ্বৈতভাব অনুভব করি অর্থাৎ জ্ঞান-নেত্রে দেখিতে পাই; কিন্তু চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সে মহান্ অদ্বৈত ভাব দেখিতে পাই না কেন? জগদীশ! আমি জানিতেছি এ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্ জগৎ তোমার অঙ্গ ও তুমি অঙ্গী। তুমি তোমার প্রকৃতি বা মায়া বা কায়ার সহিত নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন-ভাবে মিশিয়া আছ জানিতেছি, অথচ চক্ষু মেলিলেই দ্বৈত ভাবের স্ফুরণ হয় কেন? বুঝিয়াছি, যাদুকর! বুঝিয়াছি তোমার চতুরালী। বুঝিয়াছি, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা জীব-চৈতন্য বিগলিত ও বিশোধিত না হইলে তুমি নিজ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ চৈতন্যকে তাহার সহিত মিশিতে দিবে না। তাই প্রকারান্তরে নিকটে থাকিয়াও দূরত্ব রাখিতেছ! কিন্তু দেখিব তুমি কত দিন দূরত্ব রাখিতে পার! দেখিব ভক্তের টান কত দিন সহিয়া থাকিতে পার! দেখিব অবিদ্যা-পটাচ্ছাদনে কত দিন তুমি আমার জ্ঞানেক্ষণ আবৃত করিয়া রাখিতে পার! ভক্তবৎসল! ভক্তের নিকট তোমাকে অনেক বার হার মানিতে হইয়াছে। আবারও মানিতে হইবে। বল দেখি নাথ! তুমি প্রেমের বন্ধন কবে এড়াইতে পারিয়াছ? যদি পার নাই—তবে পারিবেও না, তবে কেন এ ছলনা? বুঝেছি হে প্রেম-পরীক্ষার তরে! তা পরীক্ষা কর হে, প্রাণে যত চায় তোমার! সে পরীক্ষানলে সোণা হইবে উজ্জ্বল!

স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

তোমায় চিনি চিনি করি—চিনিতে না পারি।
তোমা বিনে হে কে পারে চিনিতে তোমারে?

(২৭শে মার্চ্চ, ১৮৮৭।)

হে বিশ্বরূপ! তুমি বহুরূপীর ন্যায় কত রূপে আমায় ছলনা করিতেছ, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি তোমায় চিনি চিনি করি—কিন্তু

কিছুতেই চিনিতে পারি না। যেন কত দিনের পরিচিত সুহৃদের স্থায় তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত! কিন্তু তুমিই যে সেই প্রাণসখা, তাহা আমি বুঝি বুঝি করি—কিন্তু বুঝিতে পারি না! আমার মনে "যেন" ভাব আর ঘুচে না। ইনিই আমার সেই প্রাণসখা—অর্জ্জুনের ন্যায় এ নিশ্চিত বুদ্ধি আমার উদিত হয় না। তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান—এ কথা ভাবিতেও যেন আমার সাহস হয় না! তাই তুমি সম্মুখে থাকিতেও আমি অনবরত ডাকিয়া থাকি—"এস হে প্রাণসখে! দেখা দিয়ে রাখ প্রাণে!" কি ভ্রান্তি! ভ্রান্তি বলিয়া জানিতেছি—অথচ এ ভ্রান্তি-পাশ কাটাইতে পারিতেছি না। রাম যেমন সীতার-স্বর শুনিতেছেন—স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছেন, অথচ তিরস্করিণী-বিদ্যা-প্রভাবে সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না, সেইরূপ হে প্রাণসখে। আমি তোমার স্বর শুনিতেছি—সত্তা অনুভব করিতেছি—অথচ অবিদ্যা-প্রভাবে তোমায় দেখিতে পাইতেছি না। তখন মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছি যে তুমি নিরাকার। কিন্তু প্রাণসখে! তুমি নিরাকার এ কথা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। তুমি যদি নিরাকার হইবে—তাহা হইলে তোমায় ধ্যানযোগে দেখিতে পাই কিরূপে? সে সময় অবিদ্যা-কুহকিনী আসিয়া আমার ধ্যান-নেত্রের গতি রোধ করিতে পারে না কেন? কিন্তু আবার তোমার চৈতন্য-গর্ভ বিদ্যুদ্বপুঃ যে সময় আমার মনোগগণ উজ্জ্বলিত করিয়া হৃদয়-কমলাসনে আসিয়া আরূঢ় হয়, তখন যে আমি তোমার জ্যোতিতে অঙ্কিত-দৃষ্টি হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়ি। তখন যে সন্নিহিত মম চৈতন্য স্বচ্চৈতন্যের সহিত মিশিয়া আমার ব্যক্তিত্ব নষ্ট করিয়া দেয়। তখন যে তুমি আমি এক হইয়া যাই। তাই তোমায় তখন চিনিয়া লইতে পারি না। আমার স্তম্ভিত বুদ্ধি তোমায় তখন পূর্ণ ধারণা করিতে পারে না। তাই তুমি চলিয়া গেলে আর তোমার বর্ণনা করিতে পারি না। তখন তোমার স্মৃতি চঞ্চল সৌদামিনীর স্থায় আমার চিৎ-গগণে কেবল মধ্যে মধ্যে ক্ষীণভাবে স্ফুরিত হইতে থাকে। হে চৈতন্য-গর্ভ বিদ্যুৎ-বপুঃ সনাতন ব্রহ্ম! তোমায় যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন—তাঁহারা তোমাকে

কোন্ প্রাণে নিরাকার বলিবেন? অথচ তোমার আকার কেহই ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং তুমি নিরাকার না হইয়াও নির্দ্দিষ্ট আকার-বিরহিত। কেহই অদ্যাপি যখন তোমার প্রকৃত আকার নির্দ্দেশ করিয়া উঠিতে পারেন নাই—তখন তুমি সাকার হইয়াও নিরাকার, অথচ তুমি ইচ্ছাময়। তোমার ইচ্ছার নিয়ন্তা কেহ নাই। সুতরাং তুমি ইচ্ছা করিলে সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য—সাধকের মনোমত মূর্ত্তিতে সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পার। তুমি যখন সাধক-বাঞ্ছা-কল্পতরু, তখন কেনই বা সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তদীপ্সিত মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত না হইবে? আর তুমি যে সাধকগণের কল্পিত মূর্ত্তিতে অনেক সময় তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলে, তাহার ত ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে তোমায় সাকার বলিতে আমার আপত্তি কি? অথচ তোমার যখন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই—তখন তোমায় নিরাকার বলিয়া ডাকিতেও আমার কোনও আপত্তি নাই। বস্তুতঃ আমি তোমায় সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবেই ডাকিয়া থাকি। যখন দর্শন-পিপাসা অতিশয় উদ্দীপিত হয়—তখন তোমার নিরাকার ভাবে আমি তৃপ্তি পাই না। তখন দ্বৈতভাবে নিজ মনোমত মূর্ত্তিতে তোমায় আহ্বান করি। যে দিন সৌভাগ্য উদিত হয়, সেই দিন তোমায় সেই মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। কিন্তু সে সৌভাগ্য জীবনে অধিক দিন ঘটে নাই। বোধ হয় তোমার ভালবাসা বিচ্ছেদ চায় না, এই জন্য সাধক হইতে ভিন্নভাবে তুমি দেখা দিতে চাও না। এই জন্যই তুমি সচরাচর মহান্ অদ্বৈত ভাবে সাধককে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা কর। এই জন্যই অধিক সময় তোমায় অভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা পাই। প্রাণসখে! তুমি আমায় যে ভাবে দেখা দিবে, আমি তাহাতেই তৃপ্ত। আমার নিজের ব্যক্তিত্ব তোমার চরণে বলি দিয়াছি। নিজের প্রার্থনা নাই। নিজের স্বাতন্ত্র্য নাই। নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এক্ষণে আমায় লইয়া তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই করিতে পার। ওঁ তৎসৎ! ওঁ তৎসৎ!! ওঁ তদেবসৎ!!!

হে ব্রহ্ম! আমায় প্রকৃত ব্রাহ্মণ কর।

(২৮শে মার্চ্চ, ১৮৮৭।)

হে ব্রহ্ম। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ তোমার তেজে অনুপ্রাণিত হইয়াই 'ব্রাহ্মণ'—অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ—আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি ব্রহ্ম তেজে তেজস্বী তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। অতএব হে ব্রহ্ম! তুমি আমায় ব্রহ্মতেজে অনুপ্রাণিত করিয়া ব্রাহ্মণ কর। আমি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াই 'ব্রাহ্মণ' এই পবিত্র নাম ধারণ করিবার অধিকারী নহি। আমি উপবীত ধারণ করিতেছি বলিয়া—ব্রাহ্মণ-পদ-বাচ্য হইতে চাহি না। আমি সে বৃথা স্বত্বের প্রয়াসী নহি। আমি যে পবিত্র কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি—তাহার যোগ্য হইতে চাই। আমি পবিত্র ব্রাহ্মণ নামের সার্থকতা করিতে চাই। হে ব্রহ্ম! তুমি আমাদের কুলের প্রতিষ্ঠাতা—তাই তোমায় ডাকিতেছি, তুমি আমাকে পুনর্জীবিত কর। ব্রহ্ম-তেজ-অভাবে আমি ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছি, তুমি তোমার ব্রহ্মতেজ আমাতে সংক্রামিত করিয়া আমায় আবার ব্রাহ্মণ কর। আর ব্রহ্মতেজ-অভাবে জীবন-শূন্য হইয়া আমার চতুর্দ্দিকে যে সকল মৃত কায়া পড়িয়া আছে—ব্রহ্মতেজের অনুপ্রবেশনা দ্বারা সেই সকল মৃত দেহও পুনর্জীবিত কর। আজ তোমার ব্রহ্মতেজের অভাবে রত্নগর্ভা ভারত-ভূমি শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আমরা এই মহামূল্য নিধিতে বঞ্চিত হইয়াই—পরপদ-দলিত হইতেছি। ব্রহ্মতেজ থাকিলে আজ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে কে সাহস করিত? এই ব্রহ্মতেজের বলেই এক দিন বশিষ্ঠের মুখ হইতে অনন্ত অনীকিনী বিনির্গত হইয়া বিশ্বামিত্র-সৈন্যকে অভিভূত করিয়াছিল। এই ব্রহ্মতেজোবলেই ভরদ্বাজ মুনি স্বয়ং অনি-কেত হইয়াও রামচন্দ্রের সেবার্থ বিবিধ বিলাস-দ্রব্য-পরিপূর্ণ মহতী প্রাসাদাবলী মুহূর্ত্ত-মধ্যে বিনির্ম্মিত করিতে পারিয়াছিলেন। এই ব্রহ্ম-তেজোবলেই মহর্ষি কপিল দ্রোহকারী সগর-সন্ততিগণকে ভস্মীভূত করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জ্বলন্ত অগ্নি-কুণ্ডে তখন কেহই হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিত না। সেই তেজঃপুঞ্জীভূত মানবাকৃতি-সকল জগতের

রাজত্ব তুচ্ছ করিয়া তখন ব্রহ্মের সহিত যোগ স্থাপন করিয়া অনন্তকাল যোগাসনে বসিয়া থাকিতেন। আহার নাই—নিদ্রা নাই—বিশ্রাম নাই—বিষয়ে দৃষ্টি নাই—বিষয়-স্পৃহা-নাই। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! জগৎ এ বিশ্ব-বিজয়ী তেজঃপুঞ্জের নিকট—সতত মস্তক অবনত করিয়া থাকিত। রাজ-রাজেশ্বরগণ এই মহর্ষিগণের চরণ-রেণু কিরীটে বহন করিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেন। আজ আমরা সেই মহর্ষিগণের—সেই ভূদেবগণের—সন্ততি হইয়া যবনদাসত্বলাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হইতেছি। ছিছি কি লাঞ্ছনা! হে সনাতন ব্রহ্ম! তুমি আমাদিগকে এ দুর্গতি হইতে রক্ষা কর! তুমি আমায় ব্রহ্মতেজ দেও। যে তেজ পাইলে চিত্ত আলোকিত হয়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়, প্রাণ মহাপ্রাণতা পায়, বিষয় ছুটিয়া যায়, দাসত্ব দূর হয়, তুমি আমায় সেই ব্রহ্মতেজ প্রদান কর। তুমি আমার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মতেজে অনুচ্ছুরিত কর। তুমি ব্রহ্মতেজে আমার সর্ব্বশরীর ভরিয়া দেও, যেন আর কোন মলামাটী ইহাতে প্রবেশ করিতে না পারে। হে ব্রহ্ম! যখন তোমার তেজ অন-বরত আমাতে আসিতে থাকিবে, তখন আমার আমিত্ব পুড়িয়া ভস্মী-ভূত হইবে। তখন 'তুমি' 'আমি' এক হইয়া যাইব। হে ব্রহ্ম! তাই বলিতেছি তুমি আমায় তেজ দেও! যে তেজোবলে জগতের ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিতে পারিব, তুমি আমায় সেই ব্রহ্মতেজ দেও! যে তেজের মহিমায় তুমি আমি এক হইয়া যাইব, তুমি আমায় সেই ব্রহ্মতেজ দেও। সংক্ষেপতঃ তুমি আমায় প্রকৃত ব্রাহ্মণ কর! আমি তোমারই নিকট দীক্ষিত হইব! ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি!! ওঁ স্বস্তি!!!

সংঘর্ষ বিষম আর সহিতে না পারি।
টানাটানিতে এখন, আমি নাথ! মরি॥

(২৯শে মার্চ্চ, ১৮৮৭।)

হে ব্রহ্ম! আর যে আমি সংসারের টানাটানি সহিতে পারি না। আমার মন যে তোমার দিকে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। সংসার

যে ইহা বুঝিয়াও বুঝে না। স্ত্রী পুত্রাদি আমায় সাংসারিকতা করিতে বলে। কিন্তু আমি যে আর সাংসারিকতায় সুখ পাই না। সাংসারিকতার অনুসরণে আমি যে শুদ্ধ সুখ পাই না এরূপ নহে, আমার তাহাতে বিশেষ যন্ত্রনা হয়। আমি যতক্ষণ তোমাতে মগ্ন হইয়া থাকি, ততক্ষণ বিমলানন্দ অনুভব করি। সে আনন্দের তুলনা নাই—বর্ণনা নাই। যে যোগী হৃদয়-কমল-মধ্যে তোমার সৎ-চিৎ-স্বরূপ একবার জ্ঞাননেত্রে দেখিয়াছেন, তিনিই কেবল জানেন—এ আনন্দ কিরূপ? ইহা অনুভূতির বিষয় —বুঝাইবার বিষয় নহে। এ আনন্দ উপভোগ করিলে—মানুষ পাগল হয়; কামনা ছুটিয়া যায়। যিনি এ আনন্দ একবার অনুভব করিয়াছেন— তাঁহার আর অন্য সুখে রুচি থাকিবে কেন? কিন্তু যে নিজে এ বিমল ব্রহ্মানন্দ কখন অনুভব করে নাই—তাহাকে আমি কি দিয়া তুলনা করিয়া ইহা বুঝাইব? ইহা বুঝাইবার নহে। ইহার যে তুলনা নাই। নাথ! তোমার করুণা ব্যতীত এ জ্ঞাননেত্র ত উন্মীলিত হইবার নহে। আর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত না হইলেও ত ব্রহ্ম-দর্শন বা ব্রহ্মানুভূতি সম্ভবে না। তাই বলিতেছি নাথ! তুমি না বুঝাইলে আমি বুঝাইব কিরূপে? তুমি কৃপা না করিলে চৈতন্য-জ্ঞানের স্ফুরণ হইবে কিরূপে? চৈতন্য-জ্ঞানের স্ফুরণ না হইলে চৈতন্যানুভূতি-জনিত বিমালানন্দের উপভোগ সম্ভবে কিরূপে? সে বিমলানন্দের সম্ভোগ ব্যতীত বিষয়-ভোগ-স্পৃহা ছুটিবে কিরূপে? হে কৃপাময়! আজ আমি আমার পরিবারবর্গের প্রতিনিধি-স্বরূপ তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি কৃপা করিয়া--তাহাদিগের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত কর। তাহা হইলে তাহারা আমার মোক্ষ-সাধনের অন্তরায় না হইয়া বরং সহায়ভূত হইবে। তখন একটী সমস্ত পরিবার নির্ব্বাণ-মার্গে প্রধাবিত হইবে। বাল-বৃদ্ধ-প্রৌঢ়—সকলেই উর্দ্ধবাহু হইয়া তোমার দিকে ছুটিবে। সকলেই ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে তোমাতে নিরন্তর বিলীন হইয়া থাকিবে। একটী নব বুদ্ধ পরিবার প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। নাথ! ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রার্থনা আমার আর নাই! হে বাঞ্ছা-কল্পতরু! তুমি ভক্তের এই মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ কর! ওঁ তৎসৎ! ওঁ তৎসৎ!! ওঁ তৎসৎ!

বিষ্ঠা ও চন্দন তোমার নিকট সমান।

(৩০শে মার্চ্চ, ১৮৮৭)

হে ব্রহ্ম! যাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তিনিই জানেন যে বিষ্ঠা ও চন্দন তোমার নিকট দুইই সমান। যিনি জ্ঞান-নেত্রে দেখিবেন, তাঁহার নিকট মেধ্য ও অমেধ্য—শুচি ও অশুচি—দুইই সমান। জ্ঞানী চন্দনকে যেমন অঙ্গাভরণ করিবেন, নির্ব্বিকার চিত্তে বিষ্ঠাকেও সেইরূপ অঙ্গাভরণ করিবেন। হে বিশ্বরূপ! এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় জগতের সকলই যখন তোমারই রূপ, তখন কোন পদার্থই আমার ঘৃণার সামগ্রী হইতে পারে না। শুচি ও অশুচি জ্ঞান কেবল অবিদ্যা বা মোহের ফল। হে মহামহিম! তোমার মহিমার ইয়ত্তা করি আমার এমন সাধ্য নাই। তথাপি তুমি যে পরিমাণে আমার জ্ঞান-চক্ষুতে স্ফুরিত হইয়াছ, তাহাতে আমি বুঝিয়াছি যে তোমার রাজ্যে মেধ্য ও অমেধ্য বা হেয় ও উপাদেয় বলিয়া কোন কল্পিত ভেদ নাই। তোমার রাজ্যে চণ্ডাল ব্রাহ্মণে ভেদ নাই; বিষ্ঠা চন্দনেও পার্থক্য নাই। আমরা অজ্ঞান-চক্ষুতে কেবল আমি ভিন্ন ভাবি মাত্র। একবার নয়ন মুদিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে অনুপরাজি-মধ্য-বিরাজী সেই বিরাট পুরুষ ব্যতীত আর কোন সত্ত্বা নাই। সে মহাজ্ঞানের অভ্যন্তরে সকলেরই ব্যক্তিত্ব জ্ঞান বিলীন হইয়া যাইবে। যখন সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি অবিদ্যা-কল্পিত ও অসত্য, তখন আমি শুচি ও অশুচির মিথ্যা-জ্ঞানে বিড়ম্বিত হই কেন? তখন আমি বলিয়া গর্ব্বিত হই কেন? শুদ্ধ মনে মনে গর্ব্বিত হইয়াও তৃপ্ত হই না—চণ্ডালের বক্ষে ঘৃণার পদাঘাত করি কেন? নিজ দেহ চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া—পুরীষ-চর্চ্চিত মেথরকে দেখিয়া ঘৃণায় দূরে পলায়ন করি কেন? হে ব্রহ্ম! হে ব্যবচ্ছিন্ন-বুদ্ধি-ধ্বংসকারি! তুমি আমার মন হইতে এ ভেদ-বুদ্ধি তুলিয়া লও—এ শুচি ও অশুচি-জ্ঞান অপহরণ কর। তোমার বিশাল অভেদ-বুদ্ধিতে আমাকে মহাপ্রাণ করিয়া তোল। তুমি যেমন সূর্য্যমূর্ত্তিতে সহস্র করে নানাদিক্ হইতে অমেধ্য রস আহরণ করিয়া নিজের বক্ষোভাণ্ডার পরিপূরিত করিতেছ—এবং তাহাতে অধিকতর মহিমান্বিত হইতেছ, তুমি আমাকেও সেইরূপ সক-

লের অপকর্ষ আকর্ষণ করিয়া লইয়া অধিকতর পবিত্র ও অধিকতর উজ্জ্বল হইতে শিক্ষা দেও। তুমি যেমন অপবিত্রতা আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহার বিনিময়ে পবিত্রতা বিকীরণ করিয়া বেড়াও, আমাকেও সেইরূপ জগতের পাপ আকর্ষণ করিয়া লইয়া নিরন্তর পুণ্য ছড়াইয়া বেড়াইবার শক্তি প্রদান কর। শিব যেমন বিষ হজম করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছিলেন, তোমার কৃপা হইলে আমিও জগতের পাপ শোষণ করিয়া স্বয়ং অপাপ-বিদ্ধ হইতে পারি। হে বাঞ্ছাকল্পতরু! তুমি আমার এই বাঞ্ছা পূর্ণ কর! ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি!! ওঁ স্বস্তি!!

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

(৩১শে মার্চ্চ, ১৮৮৭।)

প্রাণেশ! আজ আমি তোমায় প্রাণভরে ডাকিতে পারিতেছি না কেন? আমার শরীরে বল নাই বলিয়া মনও যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে! শরীর ও মনে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কেন? আমার মন আমার শরীরের অনুগামী হইয়া তোমায় হারায় কেন? পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসধানম্"—'শরীরই প্রথম ধর্ম্ম সাধন', আমি দেখিতেছি শরীরই চতুর্ব্বর্গ পথের প্রথম সহায়। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের সর্ব্ব বর্গ বা যে কোন বর্গের সাধনেরই প্রথম উপাদান—শরীর। শরীর সুস্থ না থাকিলে—কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি জন্মেনা। শরীর অসুস্থ হইলে মন যেন অবশ হইয়া পড়ে। তোমায় ধ্যান করিতে বসিলাম, অমনই শরীর অবশ হইয়া পড়িল—অধিকক্ষণ আর ধ্যানস্থ থাকিতে পারিলাম না। কেন নাথ! তুমি আমাকে শরীরের এত অধীন করিলে? শরীর যাউক তাহাতে আমার দুঃখ নাই—কিন্তু শরীর অসুস্থ হইলে আমি যে তোমায় প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিনা, এই আমার কষ্ট। তাই আমি এ নশ্বর দেহের এত যত্ন করিয়া থাকি। ইহার নিজের মূল্য নাই তাহা আমি জানি, কিন্তু তোমার সহিত আমার যোগসাধন-বিষয়ে ইহার বিশেষ উপযোগিতা আছে বলিয়াই ইহা অমূল্য।

আমি জানিয়াছি যে যত দিন আমার পূর্ণ পরিপাক না হইবে—ততদিন আমাকে দেহ-রূপ স্থলীমধ্যে থাকিয়া ফুটিতে হইবে। যেমন অন্নকোষ সুসিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত পাচক স্থলীমধ্যে অন্নকে পূরিয়া অগ্নি-সংযোগে ফুটাইতে থাকে, সেইরূপ তুমিও আমাদিগকে পূর্ণ-পরিপাক-পর্য্যন্ত পঞ্চ-কোষে পূরিয়া নিরন্তর জ্ঞানাগ্নি-যোগে ফুটাইতেছ। যেমন পাচক একটী পাক-স্থলী ফাটিলে, অর্দ্ধ-স্ফুটন্ত অন্নগুলিকে আর একটী স্থলীতে ঢালিয়া সিদ্ধ করিয়া থাকেন, তেমনই এ দেহ ভগ্ন হইলে তুমি আমাদিগকে পূর্ণ-পরিপাক-পর্য্যন্ত অন্য দেহে পূরিয়া ফুটাইবে। যখন পূর্ণ-পরিপাক-পর্য্যন্ত দেহ কারাগার হইতে আমাদের মুক্তি নাই, তখন বার বার দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া লাভ কি? তাহাতে কত সময় বৃথা নষ্ট হইবে। মুক্তির দিন কিছু বিলম্বিত হইয়া পড়িবে। সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা এ দেহের যত্ন করিতে বলিয়াছেন। তাই তাঁহারা আত্মহত্যাকারীর ভীষণ দণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যে প্রতি নিয়ত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অসময়ে দেহ ভগ্ন করে সেও আত্মঘাতী। হে ব্রহ্ম! তোমার সহিত মিলিত হইবার প্রধান উপাদান যে শরীর—তাহাকে যাহাতে সুস্থ রাখিতে পারি—আমায় এরূপ জ্ঞান প্রদান কর। যেন অজ্ঞান-বশতঃ আমি আত্মঘাতী না হই—ইহাই বিধান কর।

ত্যাগেই মোক্ষ।

(১২ই এপ্রেল, ১৮৮৭।)

হে দীননাথ! কেহ কেহ এই বলিয়া আমায় ভুলাইতে যান যে 'ভোগ কর—এবং ভোগ করিতে করিতেই মুক্তি লাভ করিবে।' এই ভ্রান্ত বা প্রবঞ্চকদিগের কথা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ভোগ করিতে করিতে মুক্তি লাভ করিবার কথা ইতিহাস পুরাণাদির কুত্রাপি লিখিত নাই। কেহ কেহ জনকাদির নামোল্লেখ করিয়া আমায় বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জনক ত ভোগী ছিলেন না। তিনি ভোগ্য-বস্তু-পরিবেষ্টিত হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু ভোগের সহিত

তাঁহার যোগ ছিল না। ভোগ্য বস্তু নিকটে থাকিলেই ভোগী হয়—এরূপ নহে, ভোগ্য বস্তুর সহিত যাহার লালসা মিশ্রিত হইয়াছে—তাঁহাকেই ভোগী বলা যায়। যতক্ষণ ভোগ্য বস্তুর সহিত লালসা মিশ্রিত না হয়, ততক্ষণ ভোগ্য বস্তু নিকটে থাকিতেও আমি উদাসীন। যিনি অন্তরে অনিকেত—তাঁহার পক্ষে বৃক্ষতল, অট্টালিকা ও কুটীর তিনই সমান। তিনি অট্টালিকায় বাস করিলেও, প্রকৃত সন্ন্যাসী। যিনি কাম-বিজয়ী, তিনি পরম সুন্দরী জায়ার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াও প্রকৃত যোগী। যিনি ক্রোধ হিংসা জয় করিয়াছেন, তিনি শস্ত্রাগারে বসিয়া থাকিলেও শান্ত শিব। যিনি লোভাতীত হইয়াছেন, তিনি স্বর্ণপুঞ্জের উপর বসিয়া থাকিলেও পরম যোগী। ভোগ্য বস্তুর শারীরিক সন্নিধি ভোগাসক্তির প্রকৃত কারণ নহে। মানসিক আসক্তি প্রকৃতি-সম্ভূতা—প্রকৃতি কর্ম্ম-সম্ভূতা। জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মপুঞ্জ হইতে প্রকৃতি গঠিত হয়। ভোগ-মূলা প্রকৃতি হইলে, তাহা হইতে ভোগাসক্তি স্বতঃই উৎপন্ন হয়। এই ভোগাসক্তির সঙ্গে ভোগ্য বস্তুর যোগ হইলেই ভোগ হয়। এই ভোগ-রূপ কর্ম্ম জন্য পুনঃ-পুনরাবৃত্তি। সুতরাং ভোগ নিবৃত্ত না হইলে, মোক্ষ প্রাপ্তি অসম্ভব। তাই বলিতেছিলাম ভোগত্যাগেই মোক্ষ—ভোগে মোক্ষ নহে। যাঁহারা ভোগেই মোক্ষ বলিয়া স্বেচ্ছা-বঞ্চিত হইতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগের সেই ভ্রান্ত-বিশ্বাস-জনিত সুখের হন্তা হইতে চাহি না। আমি জানিতেছি যে ভোগ-নিবৃত্তি না হইলে তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিতে পারে না। অথবা তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিলে—ভোগ আপনি স্খলিত হইয়া যায়। নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মার দর্শন পাইলে কে অনিত্য অশুদ্ধ মোহাত্মক ভোগে আসক্ত হইবে? যদি অনিত্য ও অশুদ্ধ পরিত্যাগ না করিলে নিত্য শুদ্ধ ও বুদ্ধ পরমাত্মার দর্শন না পাওয়া যায়, তবে কোন্ মূঢ় সেই অনিত্য ও অশুদ্ধ ভোগকে পরিত্যাগ না করিবে? প্রাণেশ্বর! আমি বুঝিয়াছি যে ভোগাসক্তি থাকিতে তোমায় পাইব না। তাই, সেই ভোগাসক্তি তোমার চরণে বলি দিয়া তোমার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। একবার দেখা দিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর! তব দর্শন বিনা এ দীনের আর কোন কামনা নাই! আর কি বলিব নাথ?

রাগিণী মুলতান। তাল জলদ একতালা।

তরি ডোবে হে কাণ্ডারী বিনে !

(২৪শে মার্চ্চ, ১৮৮৭।)

(১)

তরি ডোবে হে কাণ্ডারী বিনে !
কোথায় কর্ণধার !
এবে তুফান ভারি, তু-বিনে—
কাণ্ডারী রক্ষা নাই আমার !

(২)

(আজ) তরি ডোবেহে অতল জলে।
লহ আমায় তুলে কূলে !
(হরি !) আমি মরি তাতে ক্ষতি নাই !—
(কিন্তু) হইবে যে কলঙ্ক তোমার !

(৩)

যখন তোমায় সাধারণে—
বল্‌বে ওহে হরি নিরদয় !
বল কেমনে ভক্ত জনে—
বাঁচে প্রাণে সে নিন্দায় !

(৪)

আমি মরি তাতে ক্ষতি নাই !
কিন্তু কলঙ্ক রবে তোমার—
বলি 'নিরদয়' ভাবি তাই—
আকুল হে অন্তর আমার !

(৫)

(হরি !) তরি ডোবে—নাহি রক্ষা আর !

নাহি কূল !—অকূল পাথার !

আমি অকূলে পড়িয়া ডাকি—

রক্ষ মোরে ভব-কর্ণধার !

(৬)

তুফান দেখিয়া ভয় মনে—

ওহে হরি উপজে আমার !

তুমি না রাখিলে এই দীনে—

ওহে কে রাখিবে বল আর ?

(৭)

দেখিতেছি আঁধার নয়নে !

দেখি সব অকূল পাথার !

বল হ'ব উদ্ধার কেমনে ?

হরি ! না দেখিহে পারাপার !

(৮)

আসিছেন ত্বরা করি এই দেখ মম হরি !

মম—তরি-এক-কর্ণধার !

দেখ ! প্রবল ঝটিকা নাহি আর !

ভবসিন্ধু হ'ল যেন শান্ত সরোবর !

(৯)

হরি !—বুঝেছি হে কুহক তোমার !

কেন কর আর পরীক্ষা আমার !

ওহে বিপদ-ভঞ্জন ভয়-হার !

বল কেমনে শোধিব তব ধার !

(১০)

হরি! বিপদ তুফান তুমি!
কাণ্ডারী হে তুমিই আবার!
বিভীষিকা-ভয়-হারী তুমি!
তবে কেন করি ভয় আর?

(১১)

দেও হরি! আশ্রয় তব চরণে!
এই দীন হীন ভক্ত জনে!
বল হরি! বাঁচিব কেমনে!—
অকূল পাথারে হে তু-বিনে!

(১২)

ওহে দয়াময়! ও চরণে—
নিত্য দিও স্থান এই দীনে!
তু-বিনে নাহিক গতি সে দিনে!
গতি নাই তব কৃপা বিনে!

(১৩)

(রে মন!) কেন বিষাদে মগন আর?
(তব) সম্মুখে দাঁড়ায়ে কর্ণধার!
চল ফুল্ল মনে ভব-পার!
রবে না আর দুঃখ তোমার!

অতিমানিতা বা অভিমান মোক্ষের রোধক।

(২৪শে মার্চ্চ ১৮৮৭।)

হে ব্রহ্ম! আমি জানিয়াছি যে অতিমানিতা বা অভিমান তোমার সহিত আমার বিচ্ছিত্তির জনক। আমি যদি অভিমান-ভরে, আপ-

নাকে বড় বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমার পতন আরম্ভ হইবে। কারণ আপনাকে বড় বলিয়া ভ্রম জন্মিলে মানুষ আর অগ্রসর হইতে পারে না। সেই স্থানেই তাহার উৰ্দ্ধগামিনী গতি রুদ্ধ হয়। অভিমানিতা বা আত্মাভিমান মানুষকে মোহাবৃত করিয়া ফেলে। সে তোমার সহিত তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রত্ব আর বুঝিতে পারে না। আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করে। এই মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই হিরণ্যকশিপু, দশানন ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি আত্মহারা পড়িয়া মারা গিয়াছিলেন। তুমি দর্পহারী নাথ! দর্প দেখিলেই তুমি চূর্ণ করিয়া থাক। এই দর্প ও অভিমান যে শুদ্ধ ব্যক্তিগত হয় এরূপ নহে। ইহা জাতিগত ও বংশগত ও হইয়া থাকে। যে জাতিতে বা যে বংশে এই দর্প ও অভিমান সংক্রামিত হইয়াছে, সে জাতির বা বংশের পতন অনিবার্য্য। দৃপ্ত ও অভিমানী ব্যক্তির ন্যায়, দৃপ্ত ও অভিমানী বংশ ও জাতিকেও তুমি সমুচিত দণ্ড দিয়া থাক। যতক্ষণ না তাহারা আবার আপনাদিগকে তোমার চরণের রেণুকণারও অধম বলিয়া মনে করে, ততক্ষণ তুমি তাহাদিগকে উঠিতে দেওনা। দেব! আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে হিন্দু জাতির মধ্যে আত্মমানিতা ও জাত্যভিমান অতিশয় প্রবল হওয়ায়, তুমি তাহাদিগকে দণ্ড দিবার নিমিত্তই প্রথমে যবনদিগের এবং পরে শ্বেত পুরুষগণের শাসনাধীনে রাখিয়াছ। দর্প ও অভিমান চূর্ণ করিবার জন্যই আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ অপমানিত ও পদ-দলিত হইতে দিয়াছ। আমরা এই আত্মাভিমানে অন্ধ হইয়া জগতের আর সকল জাতিকেই ঘৃণা করি এবং এই জাত্যাভিমানভরে অভিভূতবিবেক হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নির্যাতন করি বলিয়াই তুমি এখনও আমাদিগকে শ্বেত প্রহরিগণের পাহারায় রাখিয়া দিয়াছ! কিন্তু নাথ! ইহাতেও ত আমাদিগের চৈতন্য হইল না। এখনও আমরা জাত্যভিমানে অন্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নির্যাতিত করিয়া থাকি। সকলই তোমারই বা সকলই তুমি—এ জ্ঞান যাঁহার স্ফুরিত হইয়াছে—তিনি কি কখন কাহাকে ঘৃণা করিতে পারেন? তিনি কি আত্মাভিমানে অন্ধ হইয়া কাহাকেও নির্যাতন করিতে পারেন? তিনি কাহাকে ঘৃণা করিবেন—কাহাকেই

বা নির্য্যাতন করিবেন? তিনি যে জানিতেছেন— যে সকলই তাঁহারই, অথবা তিনিই সকলই। কারণ তিনি জানিতেছেন যে তুমিও তিনি একই। সেই "সোঽহং" জ্ঞানে যখন জানিতে পারিতেছেন যে সকলই তাঁহারই— বা তিনিই সকলই—তখন অভিমান ও ঘৃণা আর তাঁহার অন্তরে কিরূপে স্থান পাইবে? নাথ! জীবন-সর্ব্বস্ব! বলিয়া দেও— এ মহাজ্ঞান কবে আবার হিন্দু জাতির অভ্যন্তরে স্ফুরিত হইবে? হে সর্ব্ববিদ্ ব্রহ্ম! তুমি বলিয়া দেও কবে আমরা আবার এই মহান্ বিশ্ব-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পর নির্য্যাতন ভুলিয়া যাইব—এবং অন্যান্য জাতিকেও ভ্রাতৃ-ভাবে আলিঙ্গন করিতে পারিব। এ নীচ ঘৃণা বিদ্বেষ ও আত্মাভিমান থাকিতে আমাদের আর মুক্তি নাই। হে দয়াময়! তুমি দয়া না করিলে আর এই ঘোর নরক হইতে আমাদের উদ্ধার নাই! দয়াময়! আমি আমার জাতির পক্ষে তোমার চরণে পড়িতেছি—তুমি কৃপা করিয়া তোমার অজ্ঞান সন্ততিগণকে এ ঘোর মহান্ধকার হইতে জ্ঞানজ্যোতিতে লইয়া চল। একবার তোমার বিশ্বরূপ মূর্ত্তিতে তাঁহা-দিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অজ্ঞান মোহ বিদূরিত কর! তোমার সেই বিশ্বরূপ মূর্ত্তির আবির্ভাবে জগৎ হইতে ভেদ-বুদ্ধি একে-বারে বিদূরিত হউক্। এ সংসারের অধিকাংশ দুঃখেরই মূল—এই রাক্ষসী ভেদ-বুদ্ধি। হে নাথ! হে করুণাধার! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই ভেদ-বুদ্ধি রাক্ষসীর হস্ত হইতে মুক্ত কর। এই ভেদ-বুদ্ধিই বিকট-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে তোমার সহিত মিশ্রিত হইতে দিতেছে না। ঐ দেখ! জাতিগত, বর্ণগত, ও বংশগত বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে অন্ধ হইয়া আমরা পরস্পর পরস্পরকে পায়ে ঠেলিতেছি! পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অন্তরে বিদ্বেষ থাকায় আমরা কোন মহৎ কার্য্যেই পরস্পর প্রাণের সহিত যোগ দিতে পারিতেছি না! এস নাথ! ধর ধর!! আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা কর!!!

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

প্রণমি চরণে তব, ওহে সর্ব্বলোকাশ্রয়!

(৫ই এপ্রেল, ১৮৮৯।

(১)

প্রণমি চরণে তব, ওহে সর্ব্বলোকাশ্রয়!
চিন্ময়-স্বরূপ তুমি, পূর্ণ শান্তির আলয়!
প্রণমি চরণে তব, ওহে অদ্বৈত-স্বরূপ!
নির্গুণ ব্যাপক তুমি, ওহে বিশ্বরূপাত্মক!

(২)

জীবের শরণ্য এক, পূজ্য তুমি দয়াময়!
জগৎ-কারণ এক, তুমি হে করুণাময়!
জগতের কর্ত্তা পাতা, তথা প্রলয় বিধাতা!
তুমি এক পর তত্ত্ব, নির্ব্বিকল্প সত্যময়!

(৩)

তুমি গো ভয়ের ভয়, ভীষণের হে ভীষণ!
প্রাণিগণ-গতি তুমি, পাবনের হে পাবন!
মহোচ্চ পদের তুমি, একমাত্র নিয়ামক!
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, রক্ষকের হে রক্ষক!

(৪)

পরমেশ প্রভু তুমি, অবিনাশী সর্ব্বময়!
সকল-ইন্দ্রিয়াগম্য, তুমি দেব বিশ্বময়!
অচিন্ত্য অক্ষর তুমি, অনির্দ্দেশ্য দয়াময়!
ব্যাপক অব্যক্ত তত্ত্ব, জগদীশ দীপ্তিময়!

(৫)

বিপদ হইতে তুমি, করহে ত্রাণ আমায়!
জগতের স্বাক্ষি রূপ, নিরালম্ব একাশ্রয়!
জপিব স্মরিব শুধু, তোমায় হে করুণাময়!
ভবাম্বোধিপোত তুমি, লইব তব আশ্রয়!

(৬)

তুমি বিনা গতি নাই, হায় জীবের ধরায়!
শান্তি-দাতা তুমি এক, ভবে এক কর্ণধার!
তুমি না রক্ষিলে বল, কে রক্ষিবে হে আমায়!
(আমি)দীন হীন অসহায়—(তুমি)মোর একই সহায়!

(৭)

শুনেছি কাড়িয়া লও, ভক্তে যদি কৃপা হয়—
যা' দিয়াছ সব প্রভু! বল একি চমৎকার!
দিয়াছ সকলি নাথ! কি চাহিব বল আর?
চাহি না কিছুই আর, বিনা তব পদাশ্রয়।

(৮)

(তাই) চাহিনা নশ্বর কিছু, চাহি চিরন্তনাশ্রয়!
নমি তব পদে আমি, দেহ মোরে এই বর—
স্বজন-বর্গের সহ, পাই যেন পদাশ্রয়!
যা কিছু আছে আমার, করিনু ন্যস্ত তোমায়!

(৯)

রাখিতে যদি গো হয়, রাখ রাখ হে আমায়!
মারিতে যদ্যপি হয়, মার তুমি হে আমায়!
প্রাণ মন ধন জন, করেছি তোমায় অর্পণ!
লয়েছি আশ্রয় আমি, চরণে হে দয়াময়!

(১০)

ঠেলিয়া ফেলনা দূরে, ল'য়ো তুলে স্নেহ-করে—
দীন হীন কাঙ্গালেরে, হাবু ডুবু খেয়ে মরে—
হায় ভবসিন্ধুনীরে! তার নাহিক সহায়—
তুমি বিনা কেহ হায়!—তাই ডাকে হে তোমায়!

সসীম ব্রহ্ম।

হে ব্রহ্ম! তুমি বিশ্বব্যাপী অনন্ত ও অসীম হইলেও অজ্ঞানীরা তোমায় সীমাবদ্ধ করিয়া তুলে। আর্য্য ঋষিরা তোমার অবাঙমনসোগোচরত্ব উল্লেখ করিয়া তোমার অতীন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ তুমি বাগেন্দ্রিয় ও মনঃ ইন্দ্রিয়—উভয়েরই অগোচর। তুমি এত মহৎ ও এত বিশাল যে তোমাকে বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না।—অধিক কি তোমায় মনেতেও ধারণা করা যায় না। বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য একেবারে স্থগিত না হইলে তোমায় অনুভব করিতে পারা যায় না। যতক্ষণ সমস্ত শারীরিক ও মানসিক যন্ত্র সকল ক্রিয়া করিতে থাকিবে—ততক্ষণ তোমার দর্শন পাইব না—ততক্ষণ তোমার মধুর স্বর শ্রুত হইবে না। অন্তর্বাহ্য সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়া যেই বন্ধ হইবে, অমনই তোমার প্রতিবিম্ব চিত্রপটে প্রতিফলিত হইবে, অমনই তোমার অমৃতময় স্বর শ্রুত হইতে থাকিবে। যোগীরা কত কত দিনের ধ্যান ধারণার পর তবে এই যান্ত্রিক ক্রিয়া রোধ করিতে সক্ষম হন! দীর্ঘকালব্যাপিনী যোগ-সাধনার পর তাঁহারা তোমার দর্শন পান ও তোমার অমৃতময় ভাবিত শ্রবণ করেন। যোগীরা অতি কঠোর তপস্যায় যে যে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, ভণ্ড পুরোহিতেরা বিনা শ্রমে যজমানগণকে মৃৎপুত্তলীতে সেই সিদ্ধি প্রদান করিতে চাহেন। হে ব্রহ্ম! হরি হর বিধি তোমার যে বিশ্ব-ব্যাপিত্বের সীমা করিয়া উঠিতে পারেন

নাই. প্রবঞ্চক যাজক-মণ্ডলী নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই তোমার অসীম বিশ্বব্যাপিত্বের সীমা করিতে চাহেন। স্পর্দ্ধা কম নহে! তাঁহারা লোককে এই বলিয়া প্রতারিত করেন যে তাঁহারা তোমায় আহ্বান করিয়া আনিয়া পাষাণময়ী বা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির অভ্যন্তরে পূরিয়া রাখিয়াছেন—তুমি সেই পাষাণময়ী বা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি ভিন্ন যেন আর কুত্রাপি বিদ্যমান নহ। অহো! কি লাঞ্ছনা, কি বিড়ম্বনা! আর্য্য ঋষিরা কখন তোমাকে পাষাণময়ী বা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে আবদ্ধ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা তোমার নিখিলভুবনবীজ সচ্চিৎ-স্বরূপকে হৃদয়-কমল-মধ্যে স্থাপিত করিয়া নয়ন মুদিয়া অনবরত ধ্যান করিতেন। সেই মহাধ্যানে জীবাত্মা কোষ-মুক্ত হইয়া তোমার চৈতন্যে বিলীন হইয়া যাইত। গঙ্গার জল আসিয়া সাগরে পড়িয়া উভয় জল এক হইয়া যাইত। ভারতের সেই এক দিন, আর এই এক দিন। তখন কত কত যোগী নয়ন মুদিয়া নিরবধি ধ্যান-মগ্ন হইয়া বসিয়া ক্রমে বল্মীকসাৎ হইয়া যাইতেন! আর আজ কেবল অধমাধম সসীম ব্রহ্মের বাহ্য পূজায় লোক বিড়ম্বিত হইতেছে। তাই আজ সেই মহান্ আর্য্যধর্ম্ম কেবল অসার বাহ্য আড়ম্বর ও পৌত্তলিক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হইয়াছে। আর্য্যধর্ম্মের আত্মা চলিয়া গিয়াছে। মৃত দেহ মাত্র পড়িয়া আছে! হে দীনবন্ধু! হে সর্ব্ববিদ্! বলিয়া দেও কত দিন আমাদের এ দুরবস্থা থাকিবে? কত দিনে ভারতে আবার আর্য্যধর্ম্মের পূর্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইবে? এ ঘোর তম কত দিনে ভারত-গগণ হইতে বিদূরিত হইবে? বলিয়া দেও নাথ! কত দিন আর আমরা অন্তঃসার-শূন্য আনুষ্ঠানিকতার দাস হইয়া জড়ে পরিতৃপ্ত থাকিব? বলিয়া দেও নাথ! কত দিনে আমরা আর্য্য ঋষিগণের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া বিমল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিব? বলিয়া দেও নাথ! নহিলে এ শোচনীয় দৃশ্য আর দেখিতে পারি না! ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি!! ওঁ স্বস্তি!!!

অর্জ্জুনের পূর্ণ ব্রহ্মোস্তোত্র।

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল আড়াঠেকা।

(১লা এপ্রেল, ১৮৮৯।)

(১)

জানিলাম হও তুমি, দেব ! পুরুষ পুরাণ !
তুমি হে বিশ্বের এই, আদি পরম নিধান !
জ্ঞানের তুমি আধার, বিষয় তথা জ্ঞানের,
অনন্ত-অদ্ভুত-রূপ ! সর্ব্বভূতে ব্যাপ্যমান !

(২)

কেন না নমিব তব, চরণে হে সদাশিব !
আদিকর্ত্তা গরীয়ান, অসীম-অনন্ত-জ্ঞান !
জগন্নিবাস দেবেশ ! তুমি অক্ষর অমর !
সদসদ-পরে তুমি—সূক্ষ্ম অব্যক্ত অজর !

(৩)

তুমি বায়ু যম অগ্নি, তুমি শশাঙ্ক বরুণ !
তুমি হও প্রজাপতি, প্রপিতামহ তেমতি !
নমো নমো ও চরণে, পুনঃ পুনঃ নমো নমঃ !
সহস্র সহস্র বার, তব পদে নমস্কার !

(৪)

সম্মুখে করি গো নমঃ, সর্ব্বদিকে নমো নমঃ !
অনন্ত-বীর্য্য দেবেশ ! তুমি অমিত-বিক্রম !
সকল-আশ্রয় তুমি—সকলেতে বিদ্যমান !
মহিমা বুঝিব তব, কেমনে আমি অজ্ঞান !

(৫)

"চরাচর-লোক-পিতা, শ্রেষ্ঠ পূজ্য গুরু তথা,
নাহি তোমার সমান, নাথ! কেহ এ ধরায়!
উৎকৃষ্ট তোমার চেয়ে, নাহি কেহ ত্রিভুবনে!
প্রভাবে অপ্রতিমেয়, রূপগুণে অতুলন!

(৬)

প্রণমি তব চরণে, এক ঈশ হৃদ্মন্দিরে!
প্রসন্ন মম উপরে, হও তুমি দয়া ক'রে!
যেমতি পুত্রের পিতা, যেমতি সখার সখা—
ক্ষমে অপরাধ নাথ! তেমতি ক্ষমহে পাপ!

(৭)

বেদ-যজ্ঞ-অধ্যয়নে, উগ্র তপ ক্রিয়া দানে,
যেই রূপ তেজোময়, দেখিতে না লোক পায়,
তব কৃপাগুণে নাথ! দেখিলাম সেই রূপ!
অনাদি অদৃষ্ট-পূর্ব্ব! কমনীয়—বিভীষণ!

(৮)

সুদুর্দ্দর্শ বিশ্বরূপ, তব অপূর্ব্ব স্বরূপ—
দেখেন নাই দেবগণ! ধ্যানে দেখেন ঋষিগণ—
হায় মুদিয়া নয়ন! করি নেত্র উন্মীলন—
আমি বিনা কোন জন, পায় নাই দরশন!

(৯)

তুমি জ্ঞাননেত্র দিলে, তব রূপ-দরশন—
করে অতি মূঢ় জন—যে পরা ভক্তির গুণ
দিয়া বাঁধয়ে তোমায়! জ্ঞান-দৃপ্ত জ্ঞানিগণ—
কর্ম্ম-অন্ধ কর্ম্মিগণ, না পায় তব দর্শন!

(১০)

কামনা বর্জ্জন ক'রে, তব নামে কর্ম্ম ক'রে,
এড়ায় কর্ম্ম-বন্ধন ! মুক্ত সেই সাধু জন—.
যাঁর নাই শত্রুভাব, স্নেহ মায়ার অভাব,
সর্ব্বভূতে সমভাব, সমান লোষ্ট্র কাঞ্চন !

(১১)

ভেদাভেদ নাহি জ্ঞান, পর অপর সমান !
তাঁহার প্রতি হে তব, হয় সদা আত্ম-জ্ঞান !
সে ভক্তে তোমাতে হয়, সর্ব্ব ভেদ হে বিলয় !
তুমি তাঁর সে তোমার, নাহি আত্ম-পর-জ্ঞান !

(১২)

(আত্ম-) পুরুষকারেতে যিনি, হায় করেন নির্ভর—
চূর্ণীকৃত অভিমান, নাথ কর হে তাহার !
কৃপাসিন্ধু ! কৃপাবারি আজ করিয়া সিঞ্চন—
অজ্ঞানান্ধকার মম, হর ওহে জনার্দ্দন।

(১৩)

যাউক্ মোহ—যাউক্ মায়া—যাউক্ মম রাগদ্বেষ
চাহিনা আমি সংসার, চাহি তোমায় সারাৎসার !
চাহিনা সম্পদ মান—চাহিনা হে রাজ্য ধন !
চাহি ওহে—জনার্দ্দন !—তব অভয় চরণ !

একবার প্রাণভরে কথা কই।

(১লা বৈশাখ, ১২৯৪।)

আজ নব বৎসর ঘনঘটার গভীর গর্জ্জনের সহিত মৃদু মৃদু বর্ষণ করিতে করিতে আমার শুষ্কপ্রায় চিত্তনদীতে মধুর ভাব-স্রোত প্রবাহিত করিল। আজ আমার হৃদয়জাহ্নবীর সহিত যেন স্বর্গের মন্দাকিনীর

যোগ সংঘটিত হইল। মন্দাকিনীর প্রচণ্ড স্রোতে জাহ্নবীর স্রোত যেন বিলীন হইয়া গেল। আজ কয়দিন মন্দাকিনীর স্রোত অতি ক্ষীণবেগে বহিতেছিল বলিয়া জাহ্নবীর স্রোতের তরঙ্গায়িতত্তা যেন কিছু বাড়িয়াছিল। স্বর্গ ও মর্ত্তের সামঞ্জস্য থাকে না। একের প্রাদুর্ভাবে অপরের সঙ্কোচভাব স্বতঃসিদ্ধ। আজ দুই চারি দিন ধরিয়া আমার মন-পাখী—স্বর্গের বিমল গগন ছাড়িয়া একবার মর্ত্তের স্থূল-বায়ু-সঞ্চালিত গগণে নামিয়া বিহার করিতেছিল। একবার স্বর্গ ও মর্ত্তের সুখের তারতম্য করিবার মানসেই যেন পাখী নামিয়াছিল। কিন্তু পাখীর নামা তাহার সুখকর বোধ হইল না।

কেন সুখকর বোধ হইল না বলিতেছি! এ মর্ত্ত্যধাম অনন্ত-স্বার্থ দুষ্ট। ইহাতে জীবকুল স্ব-স্ব-স্বার্থ সাধনের জন্য নিরন্তর ছুটিতেছে। স্বার্থই সকলের দেবতা—স্বার্থ-সাধনা সেই দেবতার একমাত্র আরাধনা। জীবকুল এই আরাধনায় সতত নিমগ্ন।

'স্বার্থস্য পুরুষোদাসঃ' পুরুষ নিজ নিজ স্বার্থেরই দাস। যে স্বার্থের দাস, সে পরার্থের দাস হইতে পারে না। আজ আমার মন-পাখীর তাই এই মর্ত্ত্য ধাম ভাল লাগিল না। পাখীর কোন কামনা নাই। কিন্তু একটী বাসনা ছিল, যে সে প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা বলে। কিন্তু সে তথায় এমন কাহাকেও দেখিল না যে সে তাহার প্রাণের কথা নিঃস্বার্থভাবে শুনে! তাই পাখী আবার উড়িয়া স্বর্গরাজ্যে আসিল। যিনি স্বার্থের অতীত—প্রকৃতির অতীত—পাখী উড়িয়া স্বর্গের সেই মহাপ্রাণের কাছে বসিল। সেই মহাপ্রাণের নিজের কিছু স্বার্থ নাই বলিয়া তিনি পাখীর কথা তন্মন হইয়া শুনিতে লাগিলেন। পাখী সহানুভূতিতে গলিত হইয়া সেই প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণের কাছে প্রাণভরে মনের কথা বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতে পাখী গলিত হইয়া সেই মহাপ্রাণে মিশিয়া গেল। তখন পাখী নাই—পাখা নাই—কথা নাই—গান নাই—স্বর্গ নাই—মর্ত্ত নাই—কেবল এক মহাপ্রাণ বহিয়া গেল। তখন আমি গেলাম—আমার মন-পাখী গেল—রইল কেবল 'সোঽহং' জ্ঞান!

শান্তি-পাগল।

রাগিণী গৌরী। তাল ঝাঁপতাল।

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-স্তব।

(১)

অনেক-বক্ত্র-নয়ন! অনেকাদ্ভুতদর্শন!
অনেক দিব্যাভরণ! দিব্যানেক-শরাসন!
দিব্য-মাল্যাম্বর-ধর! দিব্যাগন্ধানুলেপন!
সর্ব্বাশ্চর্য্যময় দেব! অনন্ত-বিশ্বতোমুখ!

(২)

গগণে সহস্র রবি, যুগপৎ হ'লে উদয়,
যাদৃশী গগন-প্রভা, ওগো সমুদিত হয়!
তাদৃশী তোমার প্রভা, দেখিতেছি নারায়ণ!—
ঝলসি মম নয়ন, উজ্জ্বলিছে ঐ গগন!

(৩)

হে দেব তব দেহেতে, দেখিতেছি ভূতগণ—
ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন, ইন্দ্রাদি অমরগণ—
নারদাদি মুনিগণ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ—
পশু-পক্ষি-রক্ষোগণ, যক্ষ কিন্নর গোধন!

(৪)

অনন্ত-রূপিণী মায়া, ধরিয়া হে নারায়ণ!
ধরেছ অনেক কর, বক্ত্র নয়ন উদর?
বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর! আদি-মধ্য-অন্ত-হীন!
চক্রপাণি গদাধর! কিরীটি-ভূষিত-শির!

(৫)

"সর্ব্বদিকে দীপ্তিময়! দুর্নিরীক্ষ্য অপ্রমেয়!
চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত—অনল-রবি-সমান্!
পরম আত্মা অক্ষর! বেদিতব্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়!
তুমি হে প্রত্যক্ষ এই বিশ্বের পরম-নিধান!

(৬)

অনাদি অ-মধ্য-অন্ত! অনন্ত-বীর্য্য-আনন!
অপ্রমেয়-বাহুবল! শশি-সূরজ-নয়ন!
দীপ্ত-হুতাশন-বক্ত্র! তব দেহের কিরণ—
গ্রাসিতে তাপিত বিশ্ব, উদ্যত হে জনার্দ্দন!

(৭)

স্বরগ-ভূলোক মধ্যে তুমি এক বিদ্যমান!
সর্ব্বদিকে ব্যাপ্যমান! বল কে করে বর্ণন—
তোমার কোমল উগ্র, এইরূপ নারায়ণ!
তোমার এরূপ দেখি, প্রব্যথিত ত্রিভুবন!

(৮)

রুদ্রাদিত্য বসুগণ, সাধ্য নাম দেবগণ,
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বদেব পিতৃগণ,
গন্ধর্ব্ব অসুর যক্ষ, তথা সিদ্ধ মরুদ্গণ,
সকলে বিস্মিত হ'য়ে, হেরিতেছে তবানন!

(৯)

দেখিয়া তোমার রূপ, অনেক-বক্ত্র-নয়ন,
বহু-বাহু-উরু-পাদ, অনেক-দংষ্ট্রা-ভীষণ,
বহু-উদর-করাল,—শুন ওহে নারায়ণ!
হয়েছে ব্যথিত মন, ভয়ে কম্পিত ভুবন!

(১০)

দেখ! ঐ অমরগণ, হইয়ে সংত্রস্ত-মন
লয়েছে তব শরণ, ভয়ে জড়ীভূত-প্রাণ!
'জয় রক্ষ রক্ষ বলি'—করিছে তব স্তবন!
'স্বস্তি' বলি ঋষিগণ—করিছে তব পূজন!

(১১)

দেখিয়া তোমার এই—দীপ্ত-বিশাল-নয়ন,
দীপ্তিমতী ব্যাত্তানন, অনেক-বর্ণ-শোভন,
গগনস্পর্শিনী মূর্ত্তি—ব্যথিত হয়েছে মন—
ধৈরজ নাহিক ধরে, আর শান্তি নাহি পায়!

(১২)

কালানল-সম তব, মুখ করাল-দশন,
দেখিয়া হয়েছি আমি, হরি! দিশেহারা যেন!
সুখ নাই মনে মোর, 'প্রসীদ' মম উপর,
ঘুচাও ভয় মনের, মোর ওহে জনার্দ্দন!

(১৩)

ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ, সহ সর্ব্বরাজগণ,
তথা ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-আদি মুখ্য বীরগণ,
সকলে ত্বরিতে এবে, প্রবেশিছে তবানন,
কালানল-সম ভীম, হায় করাল-দশন!

(১৪)

যেমন নদীর স্রোত, নিয়ত হয় ধাবিত,
সমুদ্রের অভিমুখে; তেমতি তব আনন-
অভিমুখে প্রধাবিছে, প্রবৃদ্ধ ত্বরিত বেগে—
চতুর্দ্দিক হইতে দেখ, নরলোক-বীরগণ!

(১৫)

আপনার ধ্বংস জন্য, প্রবৃদ্ধ বেগেতে যথা—
প্রবেশে পতঙ্গগণ, হায়! প্রদীপ্ত জ্বলন!
দেখ যত জীবগণ, সমৃদ্ধ বেগেতে তথা—
প্রবেশিছে তব এই দংষ্ট্রা-করাল বদন!

(১৬)

গ্রসমান লেলিহান, তব জ্বলন্ত বদন,
গ্রাসিতে উদ্যত যেন, আজ সমস্ত ভুবন!
তব তেজোরাশি করে, আপূরিত ত্রিভুবন!
উদগ্র প্রদীপ্ত প্রভা, দগ্ধ করে সর্ব্বজন!

(১৭)

বলে দেও উগ্ররূপ! কে তুমি হে মহাজন!
নমি হে তব চরণে, প্রসন্ন মম উপরে,
হও দেববর! আমি জিজ্ঞাসি কি কারণ—
প্রবৃত্তি তোমার এই, বল ওহে নারায়ণ!

(১৮)

সংহর করাল মূর্ত্তি, ধর হে মোহন মূর্ত্তি,
দেখি জুড়াক নয়ন! আমি করিতে ধারণ—
নহি গো সক্ষম তব, রূপ ভীম-দরশন!
(দেখ!) ঝলসিত দুনয়ন! ভয়ে বিশুষ্ক-আনন!

(১৯)

রক্ষ রক্ষ ত্রিভুবন, কাঁদিতেছে সর্ব্বজন!
প্রলয় আগত ভেবে, সর্ব্বপ্রাণিগণ ভবে—
পরস্পর হ'তে সবে, দেখ লইছে বিদায়!
অভয় দানেতে হরি রক্ষ এই ত্রিভুবন!

আহ্বান।

(১লা বৈশাখ, ১২৯৪।)

এস হে প্রাণ-সখে! বহুদিন পরে আবার আমার হৃদয়-কুটীরের আতিথ্য গ্রহণ কর। আজ মাসাধিক তোমায় প্রাণ ভরিয়া দেখি নাই। তাই বলিতেছি এস প্রাণধন! হৃদয়কমলাসনে বসে আমার সঙ্গে একটু কথা কও। সে অমৃতভাষিত আজ কয় দিন না শুনিয়া আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। তাই বলি সখে! বিলম্ব করোনা— এস বস আমার হৃৎ-পদ্মাসন তোমার জন্য আস্তীর্ণ রয়েছে। সে আসনে বসিবার আর কাহারও অধিকার নাই—তাই ইহা শূন্য পড়ে আছে। তাই বলি এস হে নাথ! আর বিলম্ব করোনা। একবার সেই ভুবনমোহন রূপের ছটা বিকীর্ণ করিতে করিতে—আমার আঁধার কুটীর আলো করো সে এসে! আমি সাধন ভজন জানি না—তাই সরল ভাষায় ডাকৃছি তোমায়—পাতা আসনে এসে বস! ওহে ভক্ত-বল্লভ! ভক্তের আহ্বান তুমি কখন উপেক্ষা করোনা ব'লেই—ভক্তি-ভাবে তোমায় ডাকৃছি—এস! হে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু! লোকে বলে তুমি ভক্তের মনোবাঞ্ছা সতত পূরণ কর। তবে কেন আমার মনো-বাঞ্ছা জেনেও তুমি পূরণ করিতেছ না? আমি ধন চাহি না—মান চাহি না—স্বর্গ চাহি না—কাম চাহি না—চাই তোমার নিত্য দরশন! ওহে, নিত্য নিরঞ্জন! এই ভিক্ষা মোর—মম হৃদি-পটে তুমি রবে অনুক্ষণ।

তুমি বই আমার আর কেহই নাই।

১০ই মে, ১৮৮৭।

হে দীনবন্ধু! আমি জানি যে তুমি বই দীনের আর কেহ নাই। আমি দীন তাই জানি তুমি বই আমার আর কেহ নাই। আমি দীন, কেননা আমার জ্ঞান নাই—ধ্যান নাই—ভজন নাই—সাধন নাই—পূজা নাই—কর্ম্ম নাই। যে বলে তোমায় পাওয়া যায়, সেই বল নাই ব'লেই, তোমার শরণ লয়েছি। হে দীননাথ! কারণ জানি তুমি অগতির গতি।

হে প্রাণনাথ! যার জ্ঞান নাই—গান নাই—ভজন নাই—সাধন নাই—পুণ্য নাই—কর্ম্ম নাই—তার একমাত্র আশা তোমার কৃপা। হে দীনবন্ধু! তাই আমি দীন তোমার দয়ার ভিখারী হইয়া তোমার দ্বারে আজ দণ্ডায়মান। সহচর বিশ্বাস আমায় ব'লে দিয়েছে যে এ দ্বারে ভক্তি-ভাবে যে দাঁড়ায়—সে, সাধন-ভজন বিহীন হ'লেও কখন ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে ফেরেনা। হে দীননাথ! তাই আমি আজ সাধন-ভজনাদি-সম্বল-শূন্য হ'য়েও তোমার অমৃতপুরীর দ্বারে দণ্ডায়মান। দয়া করে নাথ! লও হে ভিতরে দীনে। এ জগতে তুমি বই আমার আর কেহ নাই হে! আমি জেনেছি বিশেষরূপে হে! যে তোমার দয়া বই আর গতি নাই।—হে দয়াল হরি! তাই আমি তোমার দ্বারে আজ দয়ার ভিখারী। ধ্যান, জ্ঞান, সাধন, ভজন—জানি হে বহুকালসাধ্য। আমি তত্কাল অপেক্ষা করিতে পারি না। হে দীননাথ! তোমা বিনা হে আর রহিতে পারি না! দেহ হে নাথ পদাশ্রয়! রেখনা পায় ঠেলি আর! বিনা জলে মীন বাঁচে কি কখন? বিনা প্রাণে দেহ রয় কি কখন? রবে তোমা বিনে কিসে ভক্তের জীবন? তাই বলি নাথ করোনা দেরি—লহ হে ভক্তেরে পুরীতে ভরি! হে ভক্ত বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি! লহ হে মম পাপ-রাশি হরি!

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

অন্তর্বাহ্যে দেখি এক মূরতি মোহন!

(১০ই মে ১৮৮৯)

(১)

একি দেখিলাম আমি নয়ন-মোহন—
অপরূপ রূপরাশি! ঝলসি নয়ন,
উদিল চিৎপটে মোর! দেখিনু নয়নে—
পক্ক-হেম-জিনি কান্তি সহসা গগণে!

(২)

শত দিবাকর যেন উদিল গগণে!
সমাবৃত হ'ল দিক্—সোণার বরণে!
দেখি অপরূপ রূপ স্তব্ধ মম মন!
গলিত স্থবর্ণ দেখি মুদিয়া নয়ন!

(৩)

দিবাকর-করে ঝরে অমৃতের ধারা!
জ্যোতিঃ আছে তাপ নাই—একি চমৎকারা!
জ্যোতির্ম্মণ্ডল-গোলক-মাঝে কোন জন
বিরাজ হে তুমি—দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ!

(৪)

করহে শীতল মম—সন্তাপিত প্রাণ!
জুড়াও প্রাণের জ্বালা, করিয়া বর্ষণ—
অমৃতের ধারা! তাপ করে নিবারণ
বর্ষিয়া অমৃতধারা যেমতি গগণ!

(৫)

শোক তাপ দুঃখ জ্বরে সন্তাপিত মন,
অমৃত-বর্ষণে তুমি কর সুশীতল!
যেমতি নিদাঘ-মেঘ করে দাবানল
নির্ব্বাপিত, বারিধারা করিয়া বর্ষণ!

(৬)

তুষারের ধারা-সম চৌদিকে এখন—
পড়িছে অমৃতধারা—ছাইয়া গগণ!
শীতল হইল দেহ—স্নিগ্ধ হল মন!
অন্তর্বাহে দেখি এক—মূরতি মোহন!

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়াঠেকা।

(সতত তোমাকে হরি যেন গো নেহারি !)

(১২ই মে ১৮৮৭)

(১)

হে ভয়-ভঞ্জন হরি ! যাতনা আমারি—
হৃদয়-তল-দারিণী—লহ তুমি হরি !
এ ভব-যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি !
হায় পড়িয়া দুস্তরে, প্রাণে বুঝি মরি !

(২)

হায় জাগিয়া স্বপনে দুশ্চিন্তা-অনলে—
পুড়িতেছি অবিরাম !—শান্তি নাহি মিলে !
ঝরে অবিরত হায় নয়নেতে বারি !
অন্তরের জ্বালা আমি কেমনে নিবারি ?

(৩)

হায় ! কেবল যখন মুদিয়া নয়ন,—
হৃদয়ে ভরিয়া দেখি নয়ন-রঞ্জন,
জ্যোতির্ম্ময়, স্নিগ্ধকর, অমৃত-নির্ঝারী,
পাপ-তাপ-বিনাশন, সৌম্যমূর্ত্তিধারী—

(৪)

পরপীড়ক-দুরাত্ম-থরদরশন,
দীন-দুঃখি-নিরাশ্রয়-তাপিত-সান্ত্বন,
কাতরে অভয়দাতা, অসুরবিদারী,
সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিদূরণ, দৃপ্ত-দর্পহারী—

(৫)

ভক্ত-জন-মনোলোভা, মূরতি তোমারি
নিভায় হৃদয়ানল মুহূর্ত্তে আমারি !—
জুড়ায় প্রাণের জ্বালা—বর্ষি শান্তিবারি !
মাগি ভিক্ষা—নিত্য দেখা দিও মোরে হরি !

(৬)

দেও মোরে এই বর—ওহে তাপহারী !
যখনি মুদিয়া আঁখি—তোমা পানে হেরি—
সতত তোমাকে হরি—যেন গো নেহারি—
সংসার-অনলে যেন—পুড়িয়া না মরি !

(৭)

চাহিনা সম্পদ আমি—চাহিনা সম্মান !
চাহিনা স্বরগ-সুখ ! নাহি অন্যকাম !
এই ভিক্ষা মোর—ওহে সর্ব্বদুঃখহারী !
মম হৃদি-পটে তুমি রবে নিত্য হরি !

(৮)

তব নিত্য দরশন বিনা ওহে হরি !
এ ভব-যন্ত্রণা হ'তে বাঁচিতে না পারি !
দেখা পেলে আলিঙ্গিব—এমনি শ্রীহরি !
পলাতে পারবে না আর—ক'রে লুকোচুরি !

(৯)

বাঁধিব তোমায় আমি—প্রেমডোরে হরি !
দিব না যাইতে আর—হে ভব-কাণ্ডারী !—
ফেলিয়া আমায় একা ! দোঁহে ল'য়ে তরি—
মোরা যাব ভব-পার ! শীঘ্র এস হরি !

(১০)

বিলম্ব সহে না প্রাণে !—তোমা বিনে হরি !—
মুহূর্ত্তকালের জন্য, থাকিতে না পারি !
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ—ওহে প্রাণহরি !
রহিবে কলঙ্ক তব—প্রাণে যদি মরি !

রাগিণী মুলতান। তাল আড়া।

না হেরে তোমায় প্রাণ কাঁদে যে আমার !

(১৮ই জুন ১৮৮৭।)

(১)

হে ভব-ভয়-ভঞ্জন ! না হেরে তোমায়—
হাহাকার ক'রে প্রাণ কাঁদে যে আমার !
অসার-সংসার-মাঝে, তুমি সারাৎসার !
কি ল'য়ে থাকিব তবে ফেলিয়া তোমায় ?

(২)

দারাসুত ভাই বন্ধু—সকলে সদয়—
যতক্ষণ গৃহে ধন, থাকেহে আমার !
সকলে স্বার্থেরি দাস—সকাম ধরায় !
হে ঈশ্বর তবে কেন—ভুলিব তোমায় ?

(৩)

দেখি না কাহাকে আমি, নিষ্কাম ধরায় !
পড়িলে বিপদে কেহ, হয় না সহায় !
যারে ভাবি রে আপন, ফেলিয়া পলায়—
দুঃখের সময় মোর—ফিরে না তাকায় !

(৪)

কারে বলিব আপন, ওহে দয়াময় ?
দেখিনা আপন কারে, তু-বিনা ধরায় !
স্বার্থ-শূন্য হিতকারী—বিপদে সহায়—
কামনা-রহিত বন্ধু—তুমিই আমার !

(৫)

সদা-সর্ব্ব-শিব-দাতা, হে করুণাময় !
প্রতিদান-আশা নাহি, অন্তরে তোমার !
সমভাবে পায় ত্রাণ, তোমার কৃপায়—
পুণ্যবান দুরাচার, ধনী নিরাশ্রয় !

(৬)

অধম-তারণ হরি ! নিয়ত তোমায়—
প্রাণভরে যেই ডাকে, দেও পদাশ্রয় !
স্বার্থদুষ্ট ভেদাভেদ নাহিক তথায় !
ভক্ত জনে তুমি হও, সতত সদয় !

(৭)

রবির কিরণজালে বিশোধিত হয়—
মলমূত্র ক্লেদ যত—(কিছু) বাদ নাহি যা
তেমতি তোমার প্রভো ! পড়িলে কৃপায়—
পাপী তাপী দীন দুঃখী সবে তরে যায় !

(৮)

তব কৃপালাভপক্ষে ভক্তিই সহায় !
অহেতুকী ভক্তি তাই দেহ গো আমায় !
আর কিছু নাহি কাম—ওহে সর্ব্বাশ্রয় !
প্রার্থনা আমার এক—দেও পদাশ্রয় !

রাগিণী বারোঁয়া। তাল ঠুংরি।

প্রাণ আর বাঁচে কেমনে ?

(২০শে মে ১৮৮৯)

(১)

প্রাণ আর বাঁচে কেমনে ? খর রবির কিরণে—
দগ্ধীভূত ত্রিভুবন—বহে নিশ্বাস সঘনে !
আকুলিত প্রাণিকুল—হায় বারির কারণে !
ঝরিতেছে ঘর্ম্মবিন্দু—সর্ব্ব দেহে এইক্ষণে !

(২)

হাহাকার ক'রে চাষী—ডাকে আকুলিত প্রাণে—
জগৎ-প্রাণেরে, বলে দেব ! রক্ষ মোরে প্রাণে !
রক্ষ দারাসুতগণে, রক্ষ কৃষি-প্রাণিগণে !
জলাভাবে মরে সবে, নাথ ! রক্ষে কে তু-বিনে ?

(৩)

দুর্ভিক্ষ আসিছে ঘোর—গ্রাসিতে মানবগণে—
অসহায় প্রাণিগণে—কে গো রক্ষিবে তু-বিনে ?
জলাভাবে ক্ষেত্র সব—ফাটিয়াছে নানা স্থানে !—
নবীন ধানের গাছ—শুষ্ক হতেছে এক্ষণে !

(৪)

দেখিলে বিদরে হৃদি !—হৃদে যেন বজ্র হানে !
শ্যামল শস্যের স্থানে—দেখে শুষ্ক তৃণগণে !
গোকুল আকুল হ'য়ে—ধায় সরোবর-পানে—
(কিন্তু) জল না দেখি তথায়—ফিরে ঘরে শূন্য মনে !

(৫)

ব্যাকুল গৃহস্থগণ !—অন্ন বিনা মরে প্রাণে—
হায় শত শত জন ; নাহি আশা কিছু মনে !
হতাশ হ'য়ে এক্ষণে সবে চায় তোমা পানে !
দয়াময় দীননাথ ! রক্ষ রক্ষ সবে প্রাণে !

(৬)

থাকিতে তুমি হে নাথ !—অন্ন বিনে মরে প্রাণে—
তব প্রজাগণ ! এই কলঙ্ক তোমার নামে —
ঘোষিবে জগৎ ! তাই ডাকি হে তোমায় নাথ !
স্বরগ ছাড়িয়া এসে রক্ষ রক্ষ প্রাণিগণে !

(৭)

তিন মাস জল নাই—তাপে দগ্ধে জীবগণে !
রাত্রি দিবা নিদ্রা নাই—হবে বিশ্রাম কেমনে ?
অবসন্ন দেহ হায়—লোকে খাটিবে কেমনে ?
না খাটিলে লোক সব—হায় মর্‌বে অন্ন বিনে !

(৮)

বিষম সমস্যা এই—পূরাইবে কোন্ জনে ?
শত সূর্য্য সমুদিত, দেখিতেছি হে গগণে—
কেমনে বাঁচিবে প্রাণে—চিন্তা করে সর্ব্বজনে !
শেষে মর্‌বো অন্ন বিনে—নীর্বিনে মরি এক্ষণে !

(৯)

উদিত হয় গগণে—মেঘমালা দিনে দিনে !
আসিয়া ঝড় কেমনে—উড়াইয়া দেয় ক্ষণে !
কুরঙ্গিনী জল-ভ্রমে যথা মরীচিকা-পানে—
ধাবিয়া মরে গো প্রাণে, মরুভূমির প্রাঙ্গনে—

(১০)

সেইরূপ জীবকুল আকুল, ব্যাকুল মনে—
আকাশের মেঘপানে—চাহিয়া থাকে গো দিনে!
মনে মর্মে তারা গ'ণে, বর্ষিবে দিনাবসানে!
উঠিয়া সায়াহ্নে ঝড়, মেঘে উড়ায় কেমনে!

(১১)

আশা-ভঙ্গে জীবকুল, নিয়ত মরেগো প্রাণে!
দগ্ধে দগ্ধে মরে তারা, রক্ষা নাহিক এক্ষণে!
রসাতলে যায় ধরা—বল রক্ষে কে তু-বিনে?
'ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ'—সত্য হয় হে কেমনে?

(১২)

'ত্রাহি ত্রাহি!' রবে ডাকে তোমাকে হে সর্ব্ব জনে!
সে রব শুনিয়া দেব! রবে নীরবে কেমনে?
নিষ্ঠুর নিদয় তুমি নাথ! হবে কোন্ প্রাণে?
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া এস, কর রক্ষা জীবগণে!

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল আড়াঠেকা।

জেনেছি পরীক্ষা ক'রে—তুমি সারাৎসার!

(২২এ মে ১৮৮৯)

(১)

অসার-সংসার-মাঝে সব শূন্যাকার!
জগৎ-জননী তুমি এক স্নেহাধার!
জন্মদাত্রী যিনি, তিনি মানের আধার!
অভিমানে আত্মহারা—স্ফুরিত-অধর!

(২)

পতিতপাবনী তুমি সদা নির্ব্বিকার !
ভক্তিভাবে তব পদে করি নমস্কার ?
শত শত অপরাধ—ক্ষম মা আমার !
কেমনে শোধিব, তব ঋণের মা ধার ?

(৩)

জননী কুপিতা হ'লে—ত্যজিতে সন্তান,
না করেন ইতস্ততঃ ; কিন্তু মা তোমার—
চিরদিন সম ভাব—নাহিক বিকার !
নাহি ভেদ মাগো ! ব'লে যোগ্য য়োগ্যতর !

(৪)

নাহি ভেদ স্নেহে তব, পূজি না পূজি আর !
স্নেহময়ী শুভঙ্করী—জননী আমার !
কেমনে বর্ণিব তব—করুণা অপার ?
অপরাধ শত করি, তবু নির্ব্বিকার !

(৫)

সকলে ত্যজিলে তুমি, কোলেতে তোমার—
তুলিয়া সন্তানে ল'য়ে কর গো আদর !
দীন দুঃখী নিরাশ্রয়—বড় আদরের—
ধন জননা তোমার ! কর শুভাতার !

(৬)

জগদম্বে দয়াময়ী ! বিপদ আমার—
আসিলে সকলে যায় ফেলিয়া আমায় !
তোমাকে জননী কিন্তু, যেই ডাকি আমি—
অমনি আসিয়া বস, পার্শ্বেতে আমার !

(৭)

দিলাম সাগরে ঝাঁপ, করিতে উদ্ধার—
যাহায়, উঠে সে তীরে করিল প্রস্থান !
দেখিল না সে ফিরিয়া অবস্থা আমার !
(এবে) হাবু ডুবু খেয়ে মরি, কর মা উদ্ধার !

(৮)

বিপদ-হারিণী ! হর বিপদ আমার !
তুলিয়া লহ গো মোরে ক্রোড়েতে তোমার !
জগতের ভালবাসা—সকলি অসার !
(তাই) চাহিনা থাকিতে আমি—ইহার ভিতর !

(৯)

জননী ক্রোড়েতে মোরে লহ অতঃপর !
স্নেহমাখা-করস্পর্শে জুড়াও শরীর !
পাঠায়ে দিও না আর সংসার-ভিতর !
জগতের সুখপ্রার্থী নহি আমি আর !

(১০)

অসার সুখের তরে জননী তোমায়—
ভুলিব না ভুলিব না কভু আমি আর !
জেনেছি পরীক্ষা ক'রে—তুমি সারাৎসার !—
সংসারের যাহা কিছু সমস্ত অসার !

(১১)

বৃথা মায়া-মোহে দিন কেটেছে আমার !
এখন হয়েছে মাগো ! কৃপায় তোমার—
উন্মীলিত জ্ঞাননেত্র—দর্শন প্রখর !
অসারে নিমগ্ন থাকি—ইচ্ছা নাহি আর !

(১২)

বড় সাধ মনে এবে ছাড়িয়া সংসার—
লইব শরণ মাগো চরণে তোমার !
ঘোষিব তোমার যশ—করুণা অপার !
অন্তে দিও স্থান—মাগো !—কোলের ভিতর !

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠুংরি।

কি ভয় কি ভয় গাও জননীর জয়!

(২৫শে মে ১৮৮৯।)

(১)

কি ভয় কি ভয় গাও জননীর জয়!
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেতে তিনি বিদ্যমান!
তবে ওরে মূঢ় মন! কেন কর ভয়—
যেখানে যাইবে তুমি—পাইবে অভয়!

(২)

স্থলে স্থলময় তিনি—জলে জলময়;
অজড়ে অজড়ময়—জড়ে জড়ময়!
নির্জীবে নির্জীবময়—জীবে জীবময়!
স্থূলে স্থূলময় তিনি—সূক্ষ্মে সূক্ষ্মময়!

(৩)

কেন রে অবোধ মন—মরণের ভয়?
জলে স্থলে শূন্যে স্বর্গে যেখানে যে রয়-
মায়ের কোলেতে সবে পাইবে আশ্রয়!
বিশ্বময়ী বিশ্বময় তবে কেন ভয়?

(৪)

জলেতে যাইতে তব কেন এত ভয়?
স্থলেতে তোমায় এত কে দিল অভয়;
রক্ষিলে না তিনি কেবা রক্ষিবে তোমায়?
স্থলে রক্ষিবেন তিনি জলেতে কি নয়?

(৫)

বার-বেলা-দোষে তব কেন এত ভয়?
যার নামে সর্ব্ব কার্য্য জেন সিদ্ধ হয়!
সিদ্ধকাম হয় লোক যে কাজে যে যায়!
অভক্ত সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইবে নিশ্চয়!

(৬)

ভক্তি যার দৃঢ় মনে—কিবা তার ভয় ?
জীবন মরণ তার—জননীর পায় ?
জীবন-দায়িনী মাতা থাকিলে সদয়—
থাকিবে জীবের কেন—মরণের ভয় ?

(৭)

মায়ের চরণে যিনি অর্পিত-হৃদয়—
মহামতি তিনি হন—সদা মৃত্যুঞ্জয় !
জননীর আবির্ভাবে মরণ পলায় !
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-করী—জননী আমার !

(৮)

অনলে জলেতে তুমি—প্রবেশ যথায়—
লইয়া মায়ের নাম—পাইবে তথায়—
জননীর পদাশ্রয়—তবে কেন ভয় ?
অবিশ্বাসী ভীরু অতি—তাই করে ভয় !

(৯)

মশানে শ্রীমন্তে মাতা—হইয়া সদয়—
করিলা উদ্ধার হ'তে—ঘাতকের হাত !
কৃষ্ণরূপে মাতা দিলা—প্রহ্লাদে আশ্রয় !
অমৃত হইল বিষ—মায়ের কৃপায় !

(১০)

জলধি গর্ভেতে মাতা—দিলা কোল তায় !
পদতল হ'তে হস্তী আপন মাথায়—
তুলিয়া লইল তায় মায়ের কৃপায় !
জননীর কৃপা হ'লে বল কি না হয় ?

(১১)

(ওরে) অবোধ মানব তবে কেন কর ভয় ?
জননীর নাম ল'য়ে যাও সর্ব্বস্থান।
অভয়-দায়িনী মাতা দিবেন অভয় !
এই জন্য ভক্ত জন সদাই নির্ভয় !